৬ টাকা

রাজীব স্মরণ সংখ্যা

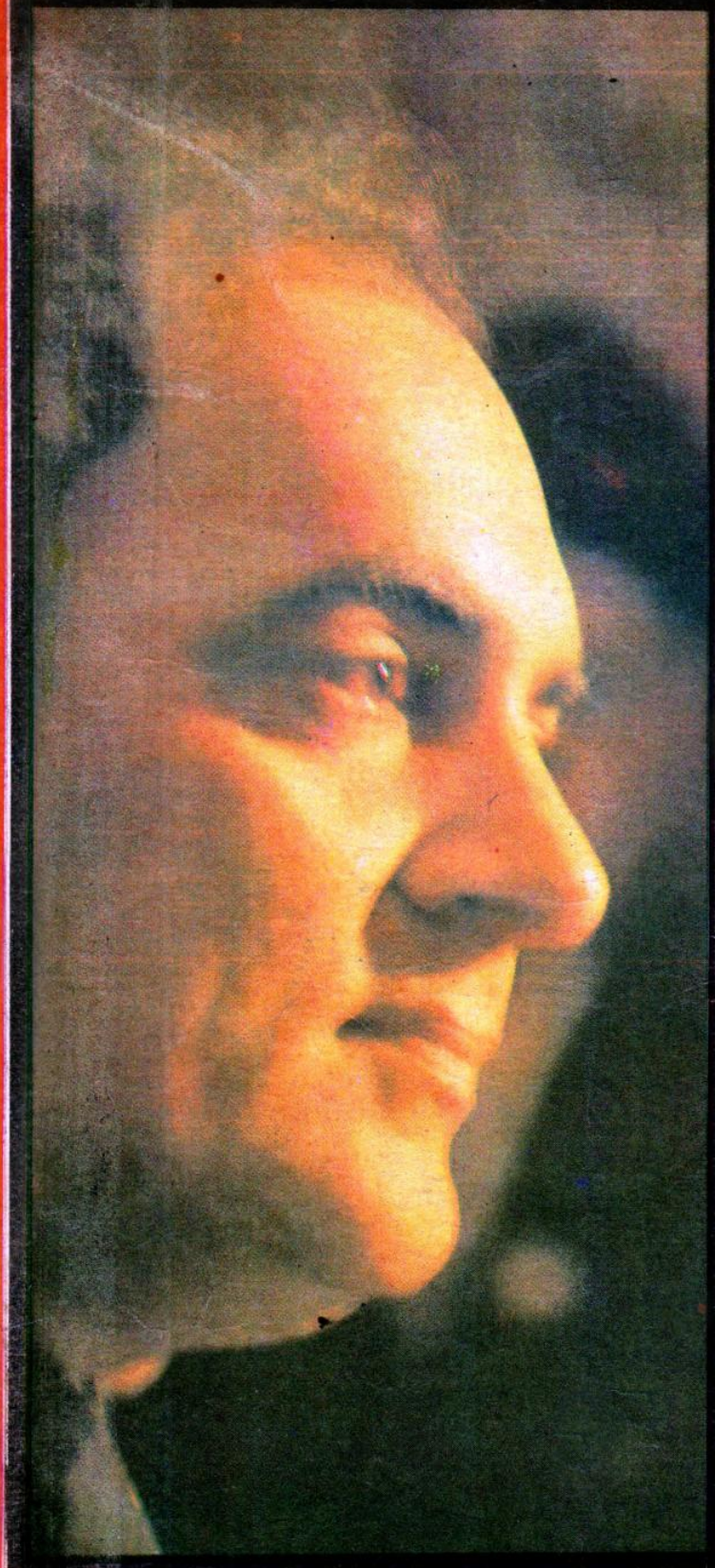

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ সান্ধ্য দৈনিক

কলকাতা

সবুজ সালওয়ার-কামিজ। হাতে চন্দন-কাঠের মালা। চোখের দৃষ্টি ওঁৎপাতা বাঘিনীর মতো। এই মেয়েটিই হয়তো রাজীবের হত্যাকারী। কিন্তু এই "মানুষ-বোমাটি"কাদের সৃষ্টি? মেয়েটির পাশে কুর্তা-পায়জামা পরনে লোকটিই-বা কে? নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কতটা ফাঁক ছিল? রাজীব কেন পেতেন "জেড" শ্রেণীর নিরাপত্তা? এছাড়াও সোনিয়ার সাক্ষাৎকার। রাহুল-প্রিয়াঙ্কার ভবিষ্যৎ। শ্রীলঙ্কায় রাজীবের প্রাণরক্ষাকারী ব্ল্যাক ক্যাটের সাক্ষাৎকার। আর সেই সব ছবি, যা দলিল হয়ে থাকবে ভবিষ্যতের কাছে।

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

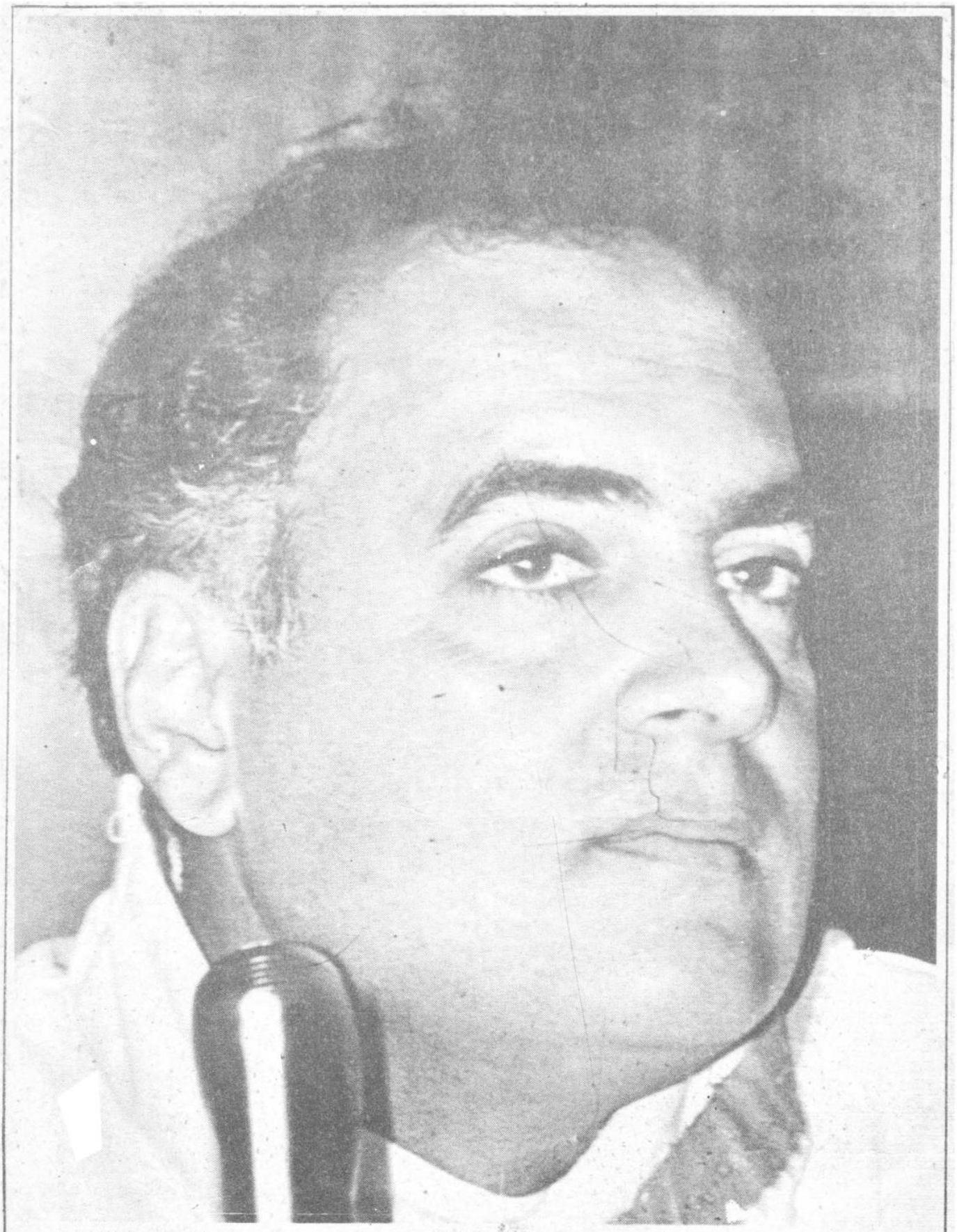

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই

বোমা বিস্ফোরণের পর রাজীব গান্ধীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ

বিদেশী সংবাদপত্রের পাতা থেকে

*বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে কিভাবে ছাপা হয়েছিল রাজীব গান্ধীর নিহত হবার খবরটি—তাই নিয়েই এই বিশেষ প্রতিবেদন **ধ্রুব চক্রবর্তীর।***

মাদ্রাজের পেরুমপুদুরের বোমা-বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধী যখন নিহত হন, তখন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। কিন্তু বিদেশের প্রচারমাধ্যমগুলি রাজীবের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি এমনভাবে "টপ প্রায়োরিটি" দেয় যার দ্বারা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাজীব তাঁর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাধারার জন্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও কি পরিমাণ সমাদৃত ছিলেন।

বিদেশের সংবাদপত্রগুলি রাজীবের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রথম পাতায় লিড-নিউজ হিসেবে ছাপে—ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ সমেত। কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের ঘাতকের হাতে নিহত হবার সংবাদ ছাপার সময় যে মনোযোগ এবং গুরুত্ব পাওয়া উচিত রাজীব হত্যাকাণ্ড তাই পেয়েছিল। অথচ রাজীব ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান। বিশ্বের ছাব্বিশটি দেশ থেকে প্রচারিত "ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন" রাজীবের নিহত হবার সংবাদটিকে প্রথম পাতায় মেন-নিউজ হিসাবে ছাপে। সঙ্গে ছিল রাজীব গান্ধীর ছবি। মাদ্রাজের পেরুমপুদুরের কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় ঠিক কি অবস্থায় বোমাটি ফেটেছিল তারও পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন। আমেরিকার অগ্রণী সংবাদপত্র গোষ্ঠী ওয়াশিংটন পোস্ট "রাজীব গান্ধী অ্যাসেসিনেটেড"—এই ব্যানার হেডিং দিয়ে রাজীব-হত্যার ঘটনাটি ছেপেছে। এই হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আলাদা "স্টোরি" করেছে পোস্ট। নিউ ইয়র্ক টাইমস রাজীব নিহত হবার খবরটি গুরুত্বসহকারে দিয়ে তাদের প্রতিনিধি মহিলা সাংবাদিকের "আই উইটনেস অ্যাকাউন্ট" বিরাট বক্স করে ছেপেছে। এছাড়াও ছাপা হয়েছে রাজীবের শেষ সাক্ষাৎকার। আন্তর্জাতিক সংবাদ সাপ্তাহিক "নিউজ-উইক" তাদের প্রচ্ছদ কাহিনী এবং প্রচ্ছদের ছবিতে এনেছে রাজীব গান্ধীকে। রাজীবের মরদেহের ছবি, রাজীবের মাল্যভূষিত প্রতিকৃতির ওপর নিউজ উইকের প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনাম টকটকে লালরঙের রঙে—"ব্লিডিং ইন্ডিয়া"। এর সঙ্গে ছোট হরফে আছে—"ফিউনারাল প্রসেশন ফর রাজীব গান্ধী। নিউ ইয়র্কের টাইম-ম্যাগাজিন প্রচ্ছদে রাজীবকে আনতে না পারলে ভিতরের পাতায় যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে এনেছে। টাইম পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য দিয়েছে রাজীবের মৃত্যু সম্পর্কে। রাজীবের অবর্তমানে ভারতের অবস্থা সম্পর্কেও আলাদা প্রতিবেদন আছে টাইমে। লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডেলি মিরর প্রথম পাতায় রাজীবের হত্যাকাণ্ডের খবর এবং ছবি ছেপেছে।

গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয় কলমে প্রশ্ন তোলা হয়েছে দুনিয়া কোন্ পথে চলেছে? ইতালির সংবাদপত্রগুলি রাজীবের মৃত্যুতে প্রায় আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছে। সোনিয়া গান্ধী ইতালির তুরিনের মেয়ে বলেই বোধহয় এটা হয়েছে। "দেললো কোরিয়েরা" সংবাদপত্রে প্রথম পাতার অর্ধেকটা জুড়েই রাজীবের হত্যাকাণ্ডের খবর। তুরিনের কাছে সোনিয়াদের বাড়ির অবস্থা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন। "দেলব্বো গেজোটো" তাদের প্রথম পাতায় আটকলম ব্যানার হেডলাইন করেছে—সাব হেডিং : 'ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন'। হেডিং : 'বোমা বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধী নিহত'। ■

নিউ দিল্লিতে ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ। ছবি : পি আই বি

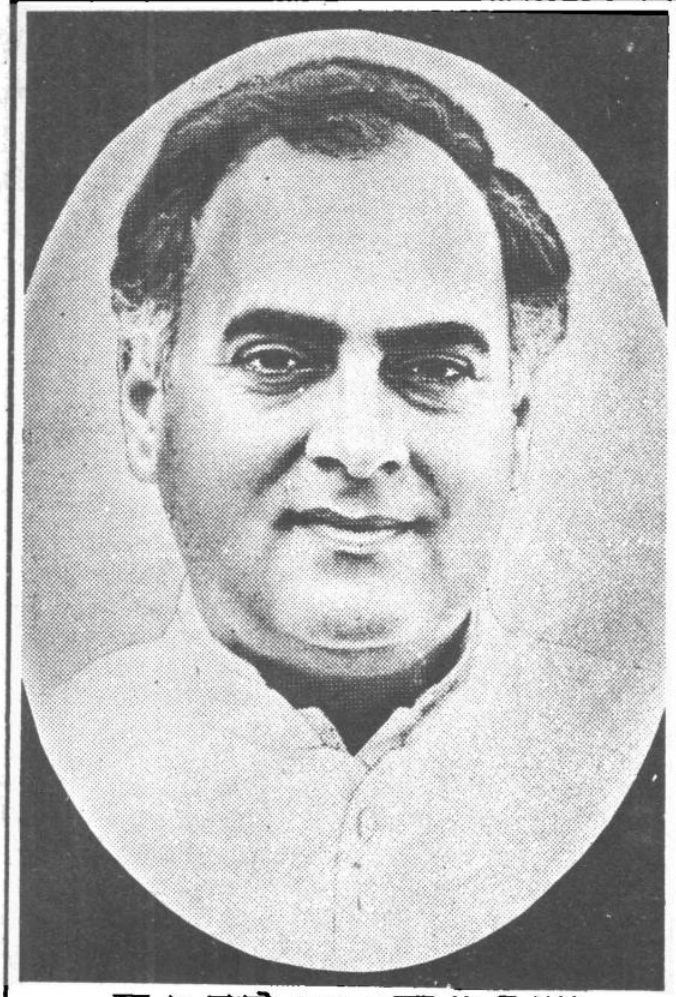

জন্ম ২০ আগস্ট, ১৯৪৪ ▫ মৃত্যু ২১ মে ১৯৯১

• সম্পাদক : সুহাস তালুকদার

• সম্পাদকীয় সহযোগিতা
কুণাল ঘোষ
জয়ন্ত চক্রবর্তী
অশোক ভট্টাচার্য

• অলংকরণ
শরদিন্দু বসু

সব্যসাচী তালুকদার কর্তৃক লয়্যাল আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬২৩১/৬২৩২, ২০-৭৬১৮/৬৬৬৩

Reg No. R. N. 48092/88 WB/CC-534

সূচিপত্র

বিস্ফোরণের পর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ------৩

বিদেশী সংবাদপত্রের পাতা থেকে ----------৪

হত্যাকারী কে?----------৬

অপরাধপ্রবণ রাজনীতির শিকার ঃ বসু----------১৩

রাজীবকে চিনতে সবারই একটু দেরি হয়ে গেল---১৫

নিরাপত্তার ঘেরাটোপ এবং রাজীব হত্যা ---------১৭

আমার পছন্দই ছিল রাজীবের পছন্দ ঃ সোনিয়া --২০

রাহুল–প্রিয়াংকা ঃ স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষৎ----------২২

আমেথি এখন----------২৫

রাজীবজী ছিলেন শরৎচন্দ্রের নিঃস্বার্থ বড়দা ------২৭

মিশতে চেয়েছিলেন রাজীব ----------২৯

বাবার দেওয়া হাত ঘড়ি ব্যবহার করতেন রাজীব ----------৩০

রাজীব গান্ধী ॥ ১৯৪৪–১৯৯১ ----------৩১

ওর বাসামো আর কাঁদেনা ----------৩৩

এক ফোঁটা চোখের জল আর সোয়ালোর গল্প----৩৪

নক্ষত্রের অকালমৃত্যুতে দুন স্কুল শোকাহত------ --৩৫

চিত্রমালা ----------৩৬

স্পোর্টিং রাজীব ----------৩৭

সম্ভাব্য আততায়ী ঃ আঘাত হানার আগে, বিস্ফোরনের পর ----------৩৮

হত্যাকারী কে?

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চারাদক। শুরু হয়ে গেল ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি। ধোঁয়ার মেঘ সরে যেতে দেখা গেল রাজীব গান্ধীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে। অবসান হল একটি সংক্ষিপ্ত যুগের। কিন্তু কাদের চক্রান্তে সাম্প্রতিককালের এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড? নেপথ্যের নায়ক কারা? কোন্ পটভূমিকায় সাজানো হয়েছিল এই মার্ডার-ট্র্যাপ? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন **কুণাল ঘোষ** *মাদ্রাজ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে-পাওয়া ব্যুরো রিপোর্টের সাহায্যে।*

সেই রাত

২১ মে, রাত সাড়ে আটটা। অন্ধ্রপ্রদেশ সফর শেষ করে মাদ্রাজ বিমানবন্দরে এসে নামলেন রাজীব গান্ধী। সাংবাদিক বৈঠক করলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা দিলেন ভিল্লিভাক্কামের দিকে। নির্বাচনী জনসভা করতে। সেখান থেকে রাত ন'টা তিরিশ মিনিটে আসলেন পুনামাল্লির সমাবেশে। এখানে ভাষণ দেবার পর রাজীবের কনভয় ছুটলো শ্রীপেরামবুদুরের দিকে। তখনও রাজীব জানেন না, সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে একটা জঘন্য চক্রান্ত, অপেক্ষা করে রয়েছে দুষ্কৃতীদের কালো হাত, অপেক্ষা করে রয়েছে মৃত্যু। খোশ মেজাজেই ছিলেন রাজীব। নিজেই চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দুই বিদেশি মহিলা সাংবাদিক। এঁদের মধ্যে গাল্ফ নিউজের নীনা গোপাল ফাঁকেফোকরে তাঁর সাক্ষাৎকার নেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্রীপেরামবুদুরের জনসভা ততক্ষণে ভরে গেছে। সকলেরই অধীর আগ্রহ, রাজীব কতক্ষণে এসে পৌঁছবেন। স্থানীয় কংগ্রেস (ই)-র পক্ষ থেকে রাজীব আসা পর্যন্ত দর্শক ও শ্রোতাদের আটকে রাখার জন্য এখানকার চলচিত্র জগতের জনপ্রিয় যন্ত্রসঙ্গীত গোষ্ঠী শঙ্কর-গণেশকে এনেছিলেন। চলছিল সঙ্গীতপর্ব। পুরো জনসভার নিরাপত্তা-ব্যবস্থা, বিশেষ করে রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা-ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন পুলিসের আই জি আর কে রাঘবন।

রাত্রি দশটা নাগাদ মঞ্চে এসে উঠলেন স্থানীয় এক কংগ্রেস নেতা। ঘোষণা করলেন, "থালাইভার (নেতা) এসে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। ঐ নেতা আরো বললেন, "আপনারা অস্থির হবেন না। রাজীবজী এখন ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন।" আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তখন স্লোগান উঠছে রাজীব গান্ধীর নামে।

ঠিক এই সময়ই শুরু হল বাজি পোড়ানো। বেশ কয়েকটা কানফাটা আওয়াজ। আকাশে আলোর ফুলঝুরি। বিস্ময়করভাবে, এই বাজিগুলো ফাটান হচ্ছিল ভি আই পি এনক্লোজারের একেবারে পাশেই। পুলিস এতে কোনোরকম বাধা দেয়নি। বাজির এই বিকট আওয়াজ শুনে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেন রাজীব। রাজ্যসভার এম পি জয়ন্তী নটরাজন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, এটা এখানকার রীতি, ঐতিহ্য। প্রিয়জনকে স্বাগত জানানো হয় এভাবেই।

মঞ্চের কাছে এসে থামল রাজীবের গাড়ি। তিনি নামলেন। ঘিরে ধরল অনুরাগীরা। শাল, মালা, ফুল, প্রণাম। একের পর এক। রাজীব মঞ্চের দিকে এগোতে লাগলেন লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে। দর্শক, কর্মী, সমর্থকরা তখন রাজীবকে দেখার জন্য, তাঁর কাছে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। চলছে স্লোগান। সঙ্গে বাজির আওয়াজ। তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি ভি রামমূর্তি জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাইকে বলতে লাগলেন, "দয়া করে আপনারা শান্ত হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। এক মিনিটের মধ্যেই আপনারা রাজীবকে মঞ্চের ওপর দেখতে পাবেন।" ঘড়িতে তখন রাত ১০-২০।

এই সময়ই সেই কানফাটা বিস্ফোরণ। মঞ্চ থেকে ১০ মিটার দূরে। বীভৎস শব্দ, আলোর ঝলকানি আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত সকলেই। তখনও কেউ বুঝে উঠতে পারেননি, ঘটনাটা কী ঘটেছে। তখনও কারুরই মাথায় আসেনি, এ বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন রাজীব। সঙ্গে আরো ১৪জন। ধোঁয়া একটু কমে এলে দেখা যায় রক্তের বন্যার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাজীবের নিষ্প্রাণ দেহ। এক মুহূর্ত আগেও যে লোকটা হাসিমুখে ফুল, মালা নিয়েছেন, তাঁর শরীরের মাঝখানটা আর মুখের সামনের দিকের কোনো অস্তিত্ব নেই। পেট চিরে বেরিয়ে এসেছে অন্ত্র। হুলুস্থুল পড়ে যায়

অনেকের অনুমান, এভাবেই হয়তো বাঁ-হাত প্রণামের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিয়ে ডান হাতে বোমার সুইচ অন করেছিল সম্ভাব্য আততায়ী।

চারদিক। একাধিক নিরাপত্তাকর্মী সহ সাধারণ মানুষ ছুটে পালাতে থাকেন। পাশাপাশি দিশেহারা হয়ে ছুটে আসতে দেখা যায় পুলিসবাহিনী, উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসারকেও। রাজীব গান্ধীর মৃতদেহ ঘিরে নিমেষের মধ্যে কর্ডন তৈরি ফেলেন তাঁরা। চারদিকে তখন ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহ আর পোড়া মাংসের গন্ধ। সব দেহগুলিই হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হতে থাকে। রাজীবের মৃত্যুসংবাদ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সাধারণ মানুষের কাছে। পুরো এলাকা জুড়ে শুধু হাহাকার রব। জনতার বুকফাটা আর্তনাদ : "থালাইভার পইত্তারু"(আমাদের নেতা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন। কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী ততক্ষণে উন্মাদের মত চড়াও হয়েছেন আই জি-র ওপর। চিৎকার করছেন," আপনারা মেরে ফেলেছেন রাজীবকে।"

সোনিয়া গান্ধী দুঃসংবাদটি জানলেন রাত ঠিক বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে। তার সামনে তখন আর কে ধাওয়ান, সীতারাম কেশরী, এম এল ফোতেদার। সোনিয়ার চোখে তখনও অবিশ্বাসের ছোঁয়া।অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর ধীর পায়ে ঢুকে যান একা একটি ঘরে। বন্ধ করে দেন দরজা। ততক্ষণে বাড়ির বাইরে জমতে শুরু করেছে কংগ্রেস(ই) নেতা ও সমর্থকদের ভিড়। সংবাদসংস্থা খবর দিয়েছিল ঘন্টাখানেক আগেই, রাত এগারোটা নাগাদ। রাজীবের বাড়ি তখন ধাওয়ান, কেশরী, ফোতেদার প্রমুখ নেতারা। বিশ্বাস করতে পারেননি তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজীবের ব্যক্তিগত সচিব ভি জর্জ টেলিফোন পান তামিলনাড়ু পুলিসের আই জি-র। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জনপথে হাজির হন রাজ্যসভা সদস্য এন সি ভাণ্ডারী। আসতে শুরু করেন শয়ে শয়ে সমর্থক। এরমধ্যে কয়েকজন মার্কিন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। জনতা ক্ষেপে ওঠে স্লোগান দিতে শুরু করেঃ মি আই এ হায় হায়! পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকলে নিরাপত্তা কর্মীরা দিল্লি পুলিসের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান।

ততক্ষণে বাড়ির ফোন্ বাজতে শুরু করেছে অবিরাম। ফোতেদার, কেশরীরা কোনোমতে সামাল দিতে শুরু করেন। সোনিয়ার ঘরে তখন চলে গেছেন প্রিয়াঙ্কা। রাহুল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। খবর এল তিনি ফিরছেন। রাত তিনটের সময় রাজীবের বাড়ির সামনে শ্মশানের পরিবেশ। সমর্থকরা কেউ কাঁদছেন, কেউ পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন, যব তক সূরজ চাঁদ রহেগা রাজীব তেরা নাম রহেগা।" সাংবাদিকদের দেখে জনতার একাংশ হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন। উপস্থিত নেতারা দৃঢ়স্বরে তাঁদের শান্ত হবার নির্দেশ নিয়ে বলেন,"এখন সামনে ভয়াবহ সঙ্কট।কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খলতা কাম্যিত নয়। ২৪ আকবর রোডে এ আই সি সি দপ্তরে তখন চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। নির্বাচনের জন্য বসান কন্ট্রোল রুমে আক্ষরিক অর্থেই চলছে ঝড়। বিহ্বল কর্মীরা কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে চলেছেন।

এরপর

রাহুল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই স্বামীর ছিন্নভিন্ন মরদেহ রাজধানীতে নিয়ে আসার জন্য মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন সোনিয়া। গভীর রাতে। বিমান তৈরিই ছিল। ভোররাতে তাঁরা পৌঁছে যান মাদ্রাজ। বিস্ফোরণের পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব গান্ধীর ছিন্নভিন্ন দেহটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে। তার সামনে জমা হতে থাকেন শয়ে শয়ে মানুষ। সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কাকে দেখে জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে মরদেহ হাসপাতাল থেকে বিমানবন্দরের ভি আই পি লাউঞ্জে আনা হয়। তিনরঙা পতাকায় আবৃত কফিনের মধ্যে শেষ শয্যায় শায়িত ছিলেন রাজীব।

২২ মে, সকাল ৮-৩৫। নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে এসে নামল বিশেষ বিমান। শ্মশানের নীরবতার মধ্যে তখন সেখানে অপেক্ষা করছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। মরদেহ তোলা হল অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের অ্যাম্বুলেন্সে। বিশাল কনভয়কে পেছনে রেখে অ্যাম্বুলেন্স ছুটল ১০, জনপথের বাড়ির দিকে। সেখান থেকে তিনমূর্তি ভবন। ২০ কিলোমিটার রাস্তার দুধারে জনসমুদ্র। চোখে শূন্যতা, অশ্রু। অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চাপা স্লোগান, "রাজীব গান্ধী অমর রহে, যবতক সূরয চাঁদ রহেগা, রাজীব তেরা নাম রহেগা , মা বেটে কা ইয়ে বলিদান, ইয়াদ রাখেগা হিন্দুস্তান। তিনমূর্তি ভবনেই শায়িত হলেন রাজীব। অগুণতি মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে লাগলেন। ২৩ মে সকালে বাবার মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালেন ছেলে রাহুল।

শেষকৃত্য

২৪ মে সূর্য যখন যমুনার বুকে মুখ লুকোচ্ছিল, আকাশের বুকে পুঞ্জীভূত মেঘের মাথায় যখন শেষবারের মত হেসে উঠেছিল সোনালি রংটা, ঠিক সেই সময় শক্তিস্থলে মায়ের সমাধির তিনশ মিটার দূরে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল রাজীব গান্ধীর পার্থিব দেহ। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল ইন্দিরা তনয়ের শেষকৃত্য। দুপুর সোয়া একটায় তিনমূর্তি ভবন থেকে শুরু হয়েছিল শেষযাত্রা। সোয়া চার ঘন্টা ধরে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুসিক্ত পথের ওপর দিয়ে মরদেহ শক্তিস্থলে পৌঁছয় পৌনে পাঁচটায়। পুরোহিত সেই গণপৎ রামাচার্য, যিনি ছ'বছর আগে রাজীবের পাশে দাঁড়িয়ে ইন্দিরার শেষকৃত্যের কাজ করেছিলেন। বেজে উঠল বিউগল। আকাশ কাঁপানো, বাতাস কাঁপানো

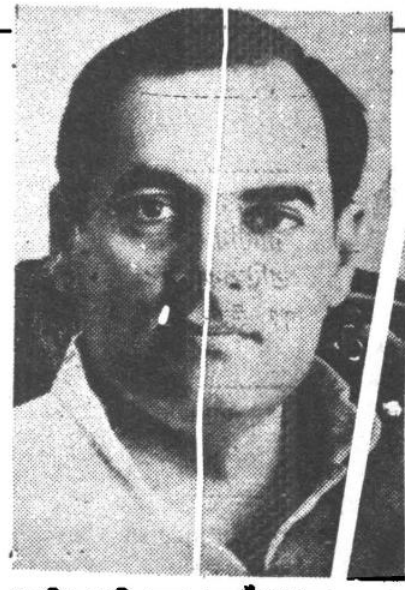

"রাজীব গান্ধী অমর রহে" স্লোগানের মধ্যে দিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন রাহুল। প্রিয়াঙ্কা আঁকড়ে ধরলেন মাকে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সারা বিশ্বের নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন দিল্লিতে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যান কোয়েল, রুশ ভাইস প্রেসিডেন্ট গেনাদি ইয়ানায়েভ, পি এল ও নেতা আরাফত, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, ব্রিটেনের যুবরাজ চার্লস, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ, আফগান প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লা ফিলিপিনসের উপ প্রধানমন্ত্রী অন্তার অর্বোস প্রমুখ। প্রত্যেকেই গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়ে যান। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সোনিয়াকে বলেন, "আর নয়। যথেষ্ট রক্ত গেছে গান্ধী পরিবারের ওপর দিয়ে। এবার তুমি, ছেলেমেয়েকে নিয়ে সংসারে আবদ্ধ রাখো নিজেকে। আপনার জায়গায় আমি থাকলে ও তাই করতাম।"

পরে চিতা থেকে সংগ্রহ করে আনা হয় চিতাভস্ম। ভোররাতে তা সংগ্রহ করে আনেন রাহুল। সঙ্গে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। অস্থিকলস রাখা হয় তিনমূর্তি ভবনে। ২৫ মে দু'টি কলস নিয়ে বিশেষ ট্রেনে রাজধানী থেকে এলাহাবাদ যাত্রা করেন সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কা, রাহুল। ভোর তিনটেয় ট্রেন পৌঁছয় আমেথিতে। সাড়ে সাতটায় এলাহাবাদ। অস্থিকলস নিয়ে যাওয়া হয় নেহরু পরিবারের পারিবারিক বাসস্থান "আনন্দভবনে"। সে দিনই, অর্থাৎ ২৮ তারিখ বিকেলে পুণ্য সঙ্গমে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পবিত্র জলধারায় বিসর্জন দেওয়া হয় রাজীবের শেষ পার্থিবঅস্তিত্বটুকু।

কিসের বিস্ফোরণ

বিস্ফোরণটা কিসের ? এই বিষয়ে আজও বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি। প্রথমে, একেবারে গোড়ায় শোনা গেছিল, আততায়ী যে ফুলের স্তবক রাজীবকে দিয়েছিলেন, তার ভিতরেই লুকনো ছিল বোমা। পরে বলা হল, না, স্তবক নয়। বোমা ছিল মালার মধ্যে।

রাজীব পরার পরই বিস্ফোরণ। এখন যেটা জানা গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে স্তবকও নয়, মালাও নয়। বোমা ছিল আততায়ীর নিজের শরীরেই। তবে যেখানেই থাকুক বোমা, বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করছেন, এত শক্তিশালী বোমা চট্ করে দেখা যায় না। বিস্ফোরণের কি মুহূর্তের মধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সে আই বি। তাতে হত্যাকাণ্ডের পেছনে এল টি টি ই-র হাতের ইঙ্গিত করে বলা হয়, বিস্ফোরকটি সম্ভবত টাইম বোমা নয়। রাজীব ঘটনাস্থলে পৌছান সোয়া এক ঘন্টার পর। অত তাড়াতাড়ি টাইম বোমায় সময় সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। রিপোর্টের অনুমান, হত্যাকাণ্ডের পিছনে দূর নিয়ন্ত্রিত মাইন।

পরে তদন্তের কাজ কিছুটা এগোবার পর অবশ্য আরো অনেকটাই জানা গেছে। তামিলনাড়ুর ফরেনসিক বিভাগের অধিকর্তা পি চন্দ্রশেখরণ বলেছেন, রাজীব যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মারা যান, সেই জিলেটিন বিস্ফোরকগুলি বাঁধা ছিল আততায়ীর কোমরের ডেনিম বেল্টের সঙ্গে। বেল্টের পেছনদিকে জিলেটিন স্টিকগুলি আটকানো ছিল। ব্যবস্থা ছিল যাতে সে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকলেই বিস্ফোরণ হয়। আততায়ী প্রণামের ভঙ্গিতে রাজীবের সামনে নীচু হতেই যন্ত্রটি চালু হয়ে যায় আর বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা আঘাত করে রাজীব গান্ধীকে। ফলে তাঁর মাথা, বুক, পেট ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

তদন্তকারী দলগুলির সূত্রে জানা গেছে, নাইট্রো-সেলুলোজ-নাইট্রোগ্লিসিরিন, যাকে চলতি কথায় জিলেটিন বলা হয়, তার কয়েকটি স্টিকই বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মাটিতে পাতা মাইন বা ঐ ধরনের কিছুর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওরকম কিছু থাকলে মাটিতে বড়রকমের গর্ত হতো। তদন্তকারী অফিসাররা ঘটনাস্থল থেকে ডেনিম বেল্টের অংশবিশেষ, কয়েক টুকরো তার, একটি বিদেশী ব্যাটারি 'ক্লু' হিসেবে পেয়েছেন। তাছাড়াও সংগ্রহ করেছেন মাটি, হতাহতদের রক্ত, পোশাক, জুতো, চুল, ফুল, মালা ইত্যাদি। জানা গেছে, যে ধরনের বিস্ফোরকের নমুনা তদন্তকারী দলগুলি পেয়েছেন, তা আমেরিকার সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি সি ১, সি ২, সি ৩-র সংমিশ্রণ বলে পরিচিত। এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত আর ডিএক্স (সাইক্লোটরিমিথিলিন ট্রিনিট্রামাইন)। বিস্ফোরকটিকে সক্রিয় করতে ১০ ভোল্টের একটি সেলের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। আততায়ী ব্যবহার করেছিল দু'ধরনের বৈদ্যুতিক সুইচ। দুটিই 'অফ' 'অন' প্রকৃতির। অনুমান, রাজীবের কাছে যাওয়ার সময়ই সে সুইচ 'অন' করে বিস্ফোরককে সক্রিয় করে নেয়। এবং তারপর প্রণামের ভঙ্গিতে নীচু হতেই বিস্ফোরণ।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, অপরাধী বিস্ফোরক ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখতে উঁচু মানের জ্যাকেট বেল্ট ব্যবহার করে। এর সামনের দিকটা সুতির কাপড়ের তৈরি। পিছনের দিকে বিস্ফোরক লুকানোর জায়গা। আরো জানা গেছে, বিস্ফোরককে আরও বেশি মারাত্মক করে তোলার জন্য তার মধ্যে ২ মিমি পুরু ছোট ছোট ইস্পাতের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সেকেণ্ডে ৫ হাজার মিটার বেগে ছুটে গিয়ে বিঁধেছিল রাজীব ও অন্যান্যদের শরীরে। সব মিলিয়ে এই বিস্ফোরকের ওজন ৪৫০ গ্রাম।

বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, রাজীবের মৃত্যুর কারণ যে বিস্ফোরক তার নাম পি ই টি এন। এর ওজনের তুলনায় বিস্ফোরণ ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। এই বোমা ফাটানোও সহজ। মাইক্রোচিপ যুক্ত ছোট 'ট্রিগারিং' ব্যবহার সাহায্যে বোমাটি ফাটানো যায়। এজিনিস

• সেই বোমা

১ *আর ডি এক্স স্টিক।*
২ *সেই ব্যাটারি।*
৩ *বিস্ফোরকগুলির যোগসূত্র ছিল এই সূক্ষ্ম তারের মাধ্যমে।*

ফুলের তোড়া, বাসকেট এমনকি শরীরেও কোনো অংশে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞরা অবশ্য আর ডি এক্স-এর ওপরই জোর দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে অঢেল পাওয়া যায় এই পদার্থ। চিনির মত জলে গুলে ছেঁকে নিয়ে আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে। আর এর বোমা বানানোও খুব সোজা। যে কেউ ঘরে বসে কয়েকটা টেস্টটিউব নিয়েই এই বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই, বিস্ফোরক কিন্তু মেটাল ডিটেকটরে ধরা পড়ার কথা। সেদিনের জনসভায় সকলকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করলে, এই দুর্ঘটনা ঘটত না।

তবে ঠিক কোনো বোমায়, কিভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। এমনও হতে পারে ঘটনাস্থলে একাধিক বোমা ফেটেছে। "মানুষ বোমা " ছাড়াও হয়ত ফুলের মধ্যেও বোমা ছিল। হয়ত একাধিক ব্যক্তি দূর থেকে বোমা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

আততায়ী কে?

এখনও পর্যন্ত এটা পরিষ্কার, আততায়ী সম্ভবত এক মহিলা। তিনি রাজীবের কাছে গিয়ে মালা দিয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে নীচু হতেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ। ভিডিও-তে ধরা পড়েছে আত্মঘাতী এই মেয়েটির ছবি। পরণে ছিল সবুজ রঙের সালোয়ার আর কমলা রঙের কামিজ। বয়স ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে। দৈর্ঘ্য ৫ ফুট। চেহারা গাট্টা-গোট্টা। বিস্ফোরণে এর বুক, পেট, পিঠ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও হাত, পা, মাথা মোটামুটি অক্ষত ছিল। মাথাটি দেহ থেকে ১০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছিল। একটি পা ছিল রাজীবের দেহের ৩ ফুট দূরে, অন্যটি ৬ফুট দূরে। মেয়েটির ডানকাঁধে ছিল সরু ঝোলা ব্যাগ। হাতে চন্দনকাঠের মালা। আশেপাশে মহিলা কংগ্রেস সমর্থকরা এবং একজন পুরুষবেশী সাংবাদিক বেশি। পুলিসের ধারণা এই লোকটিও তার সঙ্গী। তবে আততায়ী এই মহিলাকে নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, ভিডিও ছবির মেয়েটির কপালে 'টিপ' ছিল না। অথচ 'টিপ' রয়েছে আততায়ীর মৃতদেহের 'কপালে'। এখানেই সন্দেহ—তাহলে কি মৃতদেহটি ছবির ঐ মেয়েটির নয়? ঐ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গোয়েন্দারা আপাতত নাজেহাল।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট

রাজীব গান্ধীর : রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যগুলি যথাক্রমেঃ ময়না তদন্তের নম্বর : ৭১৫ /৯১। মাদ্রাজের জেনারেল হাসপাতাল।

পুলিসের দেওয়া তথ্যঃ রাজীব গান্ধী। পুরুষ। বয়স ৪৭ বছর। অপরাধ নম্বরঃ ৩২৯/৯১—শ্রীপেরামপুদুর থানা।

দেহের বর্ণনাঃ স্বাস্থ্যবান ও পেশীবহুল।

আঘাত ও ক্ষত চিহ্নের ধরনঃ বিস্ফোরণ জনিত আঘাত।

হৃদপিণ্ডঃ ছিন্নভিন্ন। দাঁত : উপরের পাটির হদিশ মেলেনি। নীচের পাটির বাঁদিকে ছয়টি এবং ডানদিকে পাঁচটি দাঁত বর্তমান।

বাঁ দিকের ফুসফুস নেই। ডান ফুসফুস আছে। যকৃৎ : ছিন্নভিন্ন। প্লীহা : অনুপস্থিত। কিডনি : ছিল।

পাকস্থলিতে কোনও খাবার ছিল না। সম্ভবত বিস্ফোরণের আগে চার ঘণ্টা তিনি কিছু খাননি।

মস্তিষ্ক : অনুপস্থিত। মৃত্যুর কারণ : বোমা বিস্ফোরণজনিত আঘাত।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে মুখের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং দেহের বাঁদিকের অংশ ও মুখমণ্ডলের বাঁদিক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

ময়না তদন্ত করার আগে চিকিৎসকরা শবদেহের এক্স রে তুলেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। এক্স রে রিপোর্ট না থাকার ফলে হাড়ের কতখানি ক্ষতি হয়েছে এবং কী ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না।

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও এম্ন রে তোলা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানেন না। কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের ময়না তদন্ত করতে হয়েছে। রাজীব গান্ধীর ময়না তদন্তের এই রিপোর্টটি মাদ্রাজের 'দ্য হিন্দু' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

আততায়ীর ঃ নিহত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আততায়ী মহিলা সম্ভবত একজন সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উগ্রপন্থী। আততায়ী মহিলার দেহাবশেষের ময়না তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্তকারী অফিসারদের একথা মনে হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট বোঝা গেছে যে ওই মহিলার দেহে কোনো 'স্টেরয়েড' বা ওই জাতীয় পদার্থ ছিল না।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা গেছে, আততায়ী মহিলার শারীরিক গঠন বেশ বলিষ্ঠ ছিল। মনে হয় ওই মহিলাকে প্রচুর শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এবং তা সেনাদের প্রশিক্ষণের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। কারণ বোঝা গেছে, মহিলার শারীরিক গড়ন ছিল ঠিক খেলোয়াড়দের মতো। তার হাত দুটির গড়নই যা একটু মেয়েলি ধাঁচের ছিল। কিন্তু পা জোড়ার পেশী খুবই বলিষ্ঠ ছিল।

পেছনে কারা ?

আততায়ীকে মোটামুটি চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও, এখনও যেটা করা সম্ভব হয়নি, তা হল, তার পরিচয় জানা। তার পেছনে কারা আছে, কোন চক্রের ইঙ্গিতে সরে যেতে হল রাজীবকে তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সর্বমহল থেকেই সন্দেহের তীর দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তামিল উগ্রপন্থী সংগঠন এল টি টি ই-র দিকে। সম্ভাব্য আততায়ীকে মনে করা হচ্ছে তাদের "সুইসাইড স্কোয়াডের" সদস্যা। প্রশ্ন হল, উগ্র তামিলরা কেন রাজীবকে হত্যা করবে? অনুমান করা হচ্ছে, তামিল জঙ্গীদের শায়েস্তা করতে শ্রীলঙ্কা সরকারকে সাহায্য করার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন রাজীব। তিনি আবার ক্ষমতায় আসলে শ্রীলঙ্কা সরকারকে নানারকম সাহায্য করতে পারেন—এই আশঙ্কাতেই এই কাজ করতে পারে এল টি টি ই। তাছাড়া, কলম্বোর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদেরও এই ঘটনার পেছনে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই এল টি টি ই কে দায়ী করা যায় এমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য কিন্তু গোয়েন্দারা এখনও সংগ্রহ করতে পারেননি। এরপর আসে রাজীব হত্যার পেছনে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রশ্ন। এখানেও কিছু যুক্তি আছে, তবে প্রমাণ নেই। যুক্তি ঃ (১) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত বাড়াবার বড় বাধা নেহরু পরিবার। (২) ভারতের নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। যাতে রাজীব গান্ধীর একটা বড় ভূমিকা ছিল। (৩) আমেরিকা কখনই চায় না এশিয়ার এই অঞ্চলের একটা স্থিতিশীল পরিস্থিতি থাকুক। এখানে অস্থিরতা

থাকলেই আমেরিকার ফায়দা। রাজীব ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্থায়ী সরকার গঠনের এবার একটা সম্ভাবনা ছিল। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় বাম দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়ায় একটা ভালো ক্ষেত্রও তৈরি করে ফেলেছিলেন রাজীব। (৪) রাজীব ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের দরুন উপমহাদেশে রুশ প্রভাব বাড়তো। (৫) উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধবিমানকে জ্বালানী দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতেই আমেরিকার বিরোধিতা করেছিলেন রাজীব। এসব দিক থেকে বিচার করলে এটা মানতেই হয় যে রাজীবের উপস্থিতি আমেরিকার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল।

এরপর আসে খালিস্তানপন্থীদের কথা। উল্লেখ্য, এরা সাধারণত এলাকার বাইরে গিয়ে কাজ করে না। দ্বিতীয়ত, এদের প্রধান অস্ত্র হাল্কা মেশিনগান। পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের হাতে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের সকলেই প্রায় গুলিতে। এই সংগঠনের হাতে কোনোরকম শক্তিশালী বোমার উপস্থিতির কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ চক্র, বিদেশী এজেন্ট, সি আই এ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, একাধিক উগ্রপন্থী সংগঠনকে লক্ষ্য করে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সঠিক যুক্তি নেই। যেখানে যুক্তি আছে সেখানে প্রমাণ নেই। এখনও পর্যন্ত তদন্ত যে অবস্থায় আছে, তাতে তদন্তকারী অফিসাররা সরকারিভাবে মুখ না খুললেও এটা হয়তো অনেকটা পরিষ্কার যে রাজীব হত্যায় হাত আছে গোটা কোনো উগ্র গোষ্ঠীর। কিন্তু তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে আসল কাজ হাসিল করে গেছে বিদেশী এক শক্তি। যে শক্তিকে শায়েস্তা করার মত বড় হাত আমাদের আছে কিনা সন্দেহ। অনেক হাঁকডাকের পর একাজ সাদ্দাম হুসেনও করতে পারেননি।

এরমধ্যে একবার শোনা গেছিল, রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী ব্রিটেনের পেশাদারি এক সৈনিক হলেও হতে পারেন। তাঁকে দিয়ে রাজীবকে খুন করতে চেয়েছিলেন কয়েকজন। মধ্য লন্ডনের কেনসিংটন হোটেলে দুপক্ষের কথাবার্তাও হয়। এই যুক্তি অবশ্য বেশিদিন ধোপে টেঁকেনি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

তদন্ত চলছে

তদন্ত চলছে দেশে, বিদেশে। শ্রীপেরামবুদুরের সেই সভাস্থল থেকে শুরু করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন গোয়েন্দারা। সি বি আই প্রধান বিজয় করণের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শ্রীলঙ্কাও ঘুরে এসেছেন। সেখানে সে দেশের প্রশাসনিক, সামরিক ও গোয়েন্দাবাহিনীর জাঁদরেল কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা এল টি টি ই-র ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনেছেন। তাঁদের অনুরোধে দু'দফায় বিমান থেকে উত্তর শ্রীলঙ্কায় জনবসতি এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য আততায়ী এবং তার পুরুষ সঙ্গীর সাদা-কালো আর রঙিন ছবি। দেশের প্রতিরক্ষা সচিব সিরিল রণতুঙ্গে বলেছেন, ছবি ছড়িয়ে প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে শুধু শ্রীলঙ্কা কেন, ভারতেও আততায়ীদের ছবি সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে ছড়িয়ে যাবার পর গোয়েন্দাদের কাছে অজস্র খবর আসছে, মাঝে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে অমুক জায়গায় অমুক মেয়েটি ছবির মতো দেখতে। যেমন সুন্দরী। বাড়ি শ্রীলঙ্কার বাবুলিয়া জেলায়। তাঁর ভাই এল টি টি ই-র সক্রিয় সদস্য, বাবা শিক্ষক। শেষমেষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই খোঁজখবর আরেকটু এগোনোর পরই এক শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। কাঞ্চিপুরম, মাদ্রাজ অঞ্চলের ৪৭ জন তামিলকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

এক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। সন্দেহভাজন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টে, শ্রীপেরম্বুদুরে বিস্ফোরণের আহত মহেন্দ্রন (৩২)-ও সুন্দর (২৪) নামে যে দুই ব্যক্তি হাসপাতাল থেকে চম্পট দিয়েছে, তাদেরও আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আগ্রায় যে অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে তার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণ শ্রীপেরামবুদুরের বিস্ফোরণ নয়, পারিবারিক অশান্তি।

প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাজ্যসভায় জানিয়ে দিয়েছেন রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে গঠিত ভার্মা কমিশনের বিচার্যসূচী বাড়ানো হবে।

প্রকৃতপক্ষে ২১ মে রাত্রি থেকে সি আই ডি-র অপরাধ শাখা থেকে শুরু করে সি বি আই পর্যন্ত তদন্তকারী দলগুলি যে খোঁজখবর চালিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত তাতে ইতিবাচক (!) কিছু পাওয়া যায়নি। রোজই টুকরো টুকরো নানা খবর প্রচারিত হচ্ছে। তবে, আততায়ী কে বা কারা—এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনোকিছুই এখনো পাওয়া যায়নি, তবুও এর মধ্যেও কিছু কিছু ইতিবাচক খোঁজ পাওয়া গেছে। জানা গেছে আততায়ীর সেই পুরুষ সাংবাদিকবেশী সঙ্গীর পরিচয়। তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনো। গোয়েন্দারা তল্লাসি চালাচ্ছেন।

অনুমান করা হচ্ছে, রাজীব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত একটা বড়রকম মোড় নিতে চলেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বহু আলোচিত সেই 'কুর্তা-পায়জামা' পরিহিত রহস্যময় ব্যক্তিটিকে 'চিহ্নিত' করা গেছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি তদন্তকারী অফিসারদের কাছে এখন আর 'অজ্ঞাত পরিচয়' নন। তদন্তের স্বার্থে সব তথ্যই অবশ্য সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমগুলির কাছ থেকে যথাসম্ভব গোপন রাখা হচ্ছে। তবে, বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, 'কুর্তা-পায়জামা'-র পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তের কাজ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। ক্রমশই লুকানো ঘটনার আরো কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন গোয়েন্দারা।

জানা গেছে, 'কুর্তা-পায়জামা' পরিহিত ঐ ব্যক্তিটি ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে কাঞ্চিপুরমের মীনাক্ষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। রাজীবের সম্ভাব্য আততায়ীর সহযোগী হিসাবে ঐ 'কুর্তা-পায়জামা' পরিহিত ব্যক্তির যে ছবি তদন্তকারী দলগুলির তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছে, সেই ছবির সঙ্গে ঐ কলেজের এক ছাত্রের অদ্ভুত সামঞ্জস্য পেয়েছেন অধ্যক্ষ রামচন্দ্রন। তিনি বলেছেন : "আমি নিশ্চিত, ঐ ব্যক্তিটি আমার কলেজের ছাত্র ছিল '৮৫ থেকে '৯০ এর মধ্যে। আরো বলেছেন, ঐ সময় মোট ৯ জন শ্রীলঙ্কান ছাত্র ছিল। ছবির ঐ লোকটি তাদের মধ্যেই একজন। নির্দিষ্টভাবে তার নাম অবশ্য এখনো জানা যায়নি। তবে অধ্যক্ষ রামচন্দ্রন ঐ ন'জন শ্রীলঙ্কার ছাত্রের নাম জানিয়েছেন। এগুলি হল: এস সি শিবদাস, ভিমুরালি, সি অরবিন্দন, থিল্লাইনাথন, এস দয়ালান, জয়াকুমার, মাডিমোহন, আনন্দরাজ এবং বৈকুণ্ঠনাথন। এর মধ্যে যে কোনো একজনই সেই 'রহস্যময়' ব্যক্তি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর থেকে অনুমান করা হচ্ছে, ঐ লোকটি কাঞ্চিপুরমের ভারাল পাচাইয়াপ্পান স্ট্রিটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি চালাতো। মাসদুয়েক আগে সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

আরো খবর, হত্যাকাণ্ডের দিন অর্থাৎ ২১ মে ঐ ব্যক্তি ক্যালিফোর্ণিয়ায় তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তদন্তকারী অফিসাররা এ-ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর করতে কাঞ্চিপুরম টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বারবার যাচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে রহস্যময় একটি 'কল'। "লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি সংবাদপত্রে ফোন করে কেউ দাবি জানিয়েছে—"এল টি টি ই সংগঠনই রাজীব হত্যার পেছনে।" ফোনটি হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দু'-একদিন পর। তদন্তকারী দলগুলি আরো খোঁজ চালাচ্ছে, ২২ মে কৃষ্ণগিরিতে রাজীব গান্ধী এবং এ আই এ ডি এম কে নেত্রী জয়ললিতার একসঙ্গে যে জনসভা করার কথা ছিল, তখনো তাঁদের হত্যা করার কোনোরকম পরিকল্পনা ছিল কী না। এবং সেক্ষেত্রে, এই আততায়ী দলটিরই সেখানে যাবার সম্ভাবনা ছিল, না কি সেখানে থাকত অন্য কোনো দল। সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে শ্রীপেরামবুদুরের 'চক্রান্ত' ব্যর্থ হলে কৃষ্ণগিরিতে আততায়ীরা হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা করতোই।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, আততায়ীরা শ্রীপেরামবুদুরের জনসভাকেই প্রথমে বেছে নিয়েছে, কারণ সেখানে রাজীবের পৌঁছনোর কথা ছিল মাঝরাতে। অন্যদিকে, কৃষ্ণগিরিতে রাজীবের জনসভা ছিল সন্ধ্যার মুখে।

তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রামমূর্তি অবশ্য এখনো এল টি টি ই এবং ডি এম কে-র প্রতি বিষোদ্গার করে চলেছেন। বলেছেন, রাজ্যের ১৫০টি আসনে নির্বাচন যাতে স্থগিত হয়ে যায়, সেজন্য রাজ্যব্যাপী ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির ছক কষছে ডি এম কে। রাজ্যপাল ভীষ্মনারায়ণ সিং-কে দেওয়া একটি স্মারকলিপিতে রামমূর্তি শ্রীপেরামবুদুরে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে একাধিক ডি এম কে নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানিয়েছেন। এই নেতাদের মধ্যে রয়েছেন ডি এম কে-র রাজ্যসভা সদস্য ওয়াই গোপালস্বামী, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব আর নাগরাজন প্রমুখ। অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, এটা এখন নিশ্চিত যে হত্যাকাণ্ডের আগে আততায়ী দলটি কাঞ্চিপুরমে কিছুদিন ছিল। তবে, এটা এখনো পরিষ্কার হয়নি যে, মহিলা কংগ্রেসনেত্রী লতা কানন এবং তাঁর মেয়ে আরাকোনাম থেকে শ্রীপেরামবুদুরের আসার মাঝপথে কাঞ্চিপুরমে গিয়েছিলেন কেন। ঐ সূত্রটি জানিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় যে দুই বিদেশি মহিলা সাংবাদিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বক্তব্যের ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে সি বি আই।

এখন প্রশ্ন হল, 'কুর্তা-পায়জামা' পরিহিত সেই রহস্যময় ব্যক্তিটি আছেন কোথায়? ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সম্ভাবনা তিনরকম (১) কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। কারণ সংবাদ মাধ্যমগুলিতে তাঁর ছবির ঢালাও প্রচারের পর কোথাও যাতায়াতের ঝুঁকি সে নেবে না। (২) ঘটনার পর রাতারাতি দেশ ছেড়ে গেছে। এবং (৩) ঐ ছবি প্রকাশিত হবার পর আততায়ী চক্র তাদের স্বার্থেই সরিয়ে দিয়েছে, যাতে সে ধরা পড়ে গিয়ে পরবর্তীকালে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে যাবার সম্ভাবনা না থাকে। 'কুর্তা পায়জামা' পরিহিত রহস্যময় ব্যক্তির পরিচয়ের 'সন্ধান' পেয়ে যাবার পর তদন্তকারী দলগুলি নতুনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, খুব শিগ্‌গিরই আরো বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলা সম্ভব হবে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত অন্য একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় একটি সান্ধ্য দৈনিকে কাঞ্চিপুরমের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর নাম দেবন। দেবন জানিয়েছেন, ছবিতে 'কুর্তা-পায়জামা' পরিহিত সাংবাদিকবেশী যে-লোকটিকে দেখা গেছে, সে গতবছর মাস কয়েক তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিল। নাম মাড়িমগন।

দেবন জানিয়েছেন, মাড়িমগন শ্রীলঙ্কার লোক। তাঁরা দু'জন আরো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৯০ সালের ৪ এপ্রিল একটি সংস্থায় কাজ শুরু করেছিলেন। নাম ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েটস। দেবনের মতে বাকি দু' জনের নাম সুরেশকুমার এবং উদয়কুমার। সুরেশকুমার শ্রীলঙ্কা নিবাসী এবং উদয়কুমার কাঞ্চিপুরমের লোক।

দেবন আরো জানিয়েছেন, মাড়িমগন কাঞ্চিপুরমের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক। বলেছেন, তাঁর সঙ্গে শ্রীলঙ্কানদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন উদয়কুমারই। তাঁর দাবি, কোম্পানির অধিকাংশ খরচাপাতিই বহন করেছিলেন তিনি এবং উদয়কুমার।

দেবন বলেছেন, মাড়িমগন চশমা পরত। সাধারণত পরণে থাকত কুর্তা পায়জামাই। এপ্রিল থেকে সংস্থার দিব্যি কাজকর্ম চলছিল। সেপ্টেম্বরে আচমকা সে বলে বসে কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যাচ্ছে। তার বিয়ের সব ঠিকঠাক। পরে টাকাপয়সা নিয়ে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তারপর থেকে তার ব্যাপারে আর কিছুই জানা যায়নি। এর মধ্যে সুরেশকুমার ও উদয়কুমার চলে যায়। কোম্পানিও উঠে যায়।

তদন্তকারী অফিসাররা গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে যদিও মুখ খুলছেন না, তবে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার নিহত হরিবাবু এবং তাঁর তোলা ছবিগুলি রীতিমতো ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে, হরিবাবু নিজে ঐ বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। একটি অক্ষত ক্যামেরা ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে, যেটিকে হরিবাবুরই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ঐ ক্যামেরা থেকে যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটিতে ধোঁয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, ধোঁয়াটা বিস্ফোরণের। কারণ তাছাড়া আর ধোঁয়া ওঠার কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, যে বিস্ফোরণে হরিবাবু নিজেই নিহত হয়েছেন, সেখানে ঠিক ঐ মুহূর্তে বা তার কয়েক সেকেন্ড পরের ছবি তিনি তুলতে সক্ষম হলেন কী করে? তা'হলে কি ঘটনাস্থলে আরো একজন চিত্রগ্রাহক উপস্থিত ছিল, যে

কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এসব ছবি তুলেছে? পরে সম্ভবত দৌড়ঝাঁপের সময় ক্যামেরাটি পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই? এই 'দ্বিতীয়' কারুর উপস্থিতির বিষয়টি এখন গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন।

তদন্তকারী অফিসাররা আরো একটি ব্যাপার নিয়ে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এখন ছবিটা হরিবাবুই তুলুন বা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিই তুলুন, প্রশ্ন হল, আততায়ী কী করে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তার ছবি তুলতে দিল, যখন ঐ ছবি পরবর্তীকালে তদন্তের হাতিয়ার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে? এই ছবি তোলার সময় আততায়ীর ছবি আসতে পারার সম্ভাবনা দেখে তাঁর অন্যান্য সহযোগীদেরও তাকে সাবধান করার কথা। তাদের চক্রের স্বার্থেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সেসব কিছুই হয়নি।

এক্ষেত্রে আর একটা প্রশ্ন হল, হরিবাবু হঠাৎ ঐ মহিলা আর তার সহযোগীদের ছবি তুললেন কেন? ঐ বিশাল ভিড়ের মধ্যে একের-পর-এক এদের ছবি তোলার কারণটা কী? তা'হলে কি হরিবাবু ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের ছবি তুলেছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গোয়েন্দারা।

হরিবাবু যে ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে ক্যামেরাটি নিয়েছিলেন, সেই রবিশঙ্কর জানিয়েছেন, ক্যামেরায় ছিল ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স। শঙ্কর বলেছেন তিনি শ্রীপেরামবুদুরে রাজীব গান্ধীর সভার ছবি তুলতে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও সেই একটিই অত গুরুত্বপূর্ণ একটি সভা 'কভার' করতে গিয়ে কোনো চিত্রসাংবাদিক অজানা, অচেনা এক মহিলার একের-পর-এক ছবি তুলে ফিল্ম নষ্ট করবেন কেন?

পুলিস খোঁজ করছে, হরিবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের যোগসাজস ছিল কিনা। এক্ষেত্রে আবার পাল্টা যুক্তি এসে যায়, হরিবাবু যদি বিস্তারিতভাবে সব জানতেন, তা'হলে নিশ্চয়ই রাজীব গান্ধীর অত কাছে থাকতেন না, যেখানে তাঁর নিজেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, তাঁর কাছে তো জুম লেন্স ছিলই। ছবি তোলার হলে নিরাপদ দূরত্ব থেকেও তুলতে পারতেন।

হরিবাবুর সঙ্গে আগে এল টি টি ই-র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদের অনুষ্ঠানের ছবি হরিবাবুই তুলতেন।

ছবির থেকে সৃষ্ট আরো দুটি বিষয় হল—১) ছবির আততায়ীর মুখ আর সম্ভাব্য আততায়ীর ছিন্নভিন্ন দেহের মুখের মিল খুব কম। ২) মৃতদেহের মুখটির কপালে একটি 'টিপ' আছে। যা নেই ছবির আততায়ীর কপালে। তা'হলে কি দুই মহিলা এক নন? বা ছবির ঐ মহিলা এখনো বেঁচে আছেন?

প্রকৃতপক্ষে, নানা প্রশ্ন, যুক্তি, পাল্টা যুক্তিতে নাজেহাল গোয়েন্দারা অত্যন্ত সন্তর্পণে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আপাতত বিশেষভাবে তাঁরা চিহ্নিত ঐ ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে।

রাজীব গান্ধীকে হত্যা করার আগে আততায়ীচক্র রীতিমতো মহড়া দিয়েছিল। এই মহড়া হয়েছিল তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক সীমান্তের গুদালুরের কাছে একটি জঙ্গলের মধ্যে। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে পুলিস এবং তদন্তকারী দলগুলি অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গলে রিহার্সাল বা মহড়ার বিষয়টি এখন রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনুমান করা হচ্ছে, অল্পসংখ্যক সেঠিক সংখ্যা বোঝা যাচ্ছে না) কয়েকজন দুষ্কৃতী দু-তিনদিন ধরে এই মহড়া দিয়েছে। সঙ্গে ছিল আততায়ী।

তারা টার্গেট হিসাবে ব্যবহার করেছে রাজীব গান্ধীর প্রমাণ সাইজের একটি 'কাট আউট'-কে । ঠিক কীভাবে এগোতে হবে, রাজীব গান্ধীর সামনে নূন্যতম কতটা দূরত্বের মধ্যে দাঁড়াতে হবে এবং কীভাবে নিচু হলে বেল্ট বোমায় বিস্ফোরণ ঘটবে—এসবের মহড়া দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের রিপোর্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে

ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হরিবাবু : এঁর তোলা ছবিগুলি কিসের ইঙ্গিত?

পুলিস সম্ভাব্য সবরকমভাবে তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

পাশাপাশি, কোয়াম্বাটুরের সেই ভ্যান ড্রাইভার সেলভারাজকে জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে পুলিস। তবে, যে-মহিলা সেলভারাজের কাছে 'লিফট' চেয়েছিলেন, সেই মহিলাই আততায়ী কিনা পুলিস ও গোয়েন্দারা সে-ব্যাপারে কোনোরকমভাবেই নিশ্চিত হতে পারেনি।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, দ্রাবিড় কাজাঘাম নেতা কে রামকৃষ্ণণের বাড়ি চারজন এল টি টি ই আততায়ী আত্মগোপন করেছিল বলে যে খবর পাওয়া গিয়েছিল, তা সম্ভবত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উল্লেখ্য, এই নেতাটি সম্প্রতি দ্রাবিড় কাজাঘামের ভিরামানি গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আপাতত নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিদাথালাই পুলিগাল খোজামাই ইয়াকাম নামে একটি গোষ্ঠীর, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তামিল উগ্রপন্থীদের। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, রামকৃষ্ণণ অতি সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এল টি টি ই নেতা ভি প্রভাকরণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, রহস্যময় সেই কুর্তা পায়জামা পরিহিত মানুষটি নৌকো করে শ্রীলঙ্কায় পালানোর চেষ্টা করার সময় ধরা পড়েছে বলে যে-খবর ছড়িয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর তল্লাশি এখনো চলছে।

ইতিমধ্যে আরেকটি খবর নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, আততায়ী যে নীল অ্যাম্বাসাডার গাড়িটিতে করে ঘটনাস্থলে এসেছে বলে অনুমান করা হচ্ছিল, ভিডিও ফিল্ম থেকে সেই গাড়িটির চেহারা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর একটি টুরিস্ট ট্যাক্সি সার্ভিস থেকে গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। ড্রাইভার জানিয়েছে, সম্ভাব্য ঐ আততায়ীর সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিল। ঐ দু'জন নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিল বিদেশী সাংবাদিক হিসেবে। তারা নাকি রাজীব গান্ধীর সভা 'কভার' করতে এসেছিল। ঐ দু'জন বারবার একজন চিত্রসাংবাদিকের খোঁজ করছিল। পরে তাদের সঙ্গে হরিবাবুর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় ড্রাইভারটিই।

সি বি আই অফিসাররা মিনাবাক্কাম বিমানবন্দরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি কাউন্টারের একজন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। জানা গেছে, ৫ থেকে ১০ মে-র মধ্যে সম্ভাব্য আততায়ীর মতো দেখতে একটি তরুণী এই কাউন্টার থেকে ২০০ ডলারের একটি ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়েছে।

সম্ভাব্য আততায়ী সেই মহিলা এল টি টি ই-র ২৫ জন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ 'স্যুট স্কোয়ার্ডের' সদস্য ছিল। এই ২৫ জনই ২১ তারিখ অভিশপ্ত রাতে ঘটনাস্থলেই ছিল। এদের মধ্যে অর্ধেকই (প্রায় ১২ জন) এখনো তামিলনাড়ুতে রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, তদন্তকারী দলগুলি এখন এই সন্দেহ করছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের দৃঢ় বিশ্বাস, রাজীব-হত্যার সঙ্গে জড়িত অনেকেই এখনো ধারেকাছে রয়েছে। তাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবরকমভাবে তদন্তের কাজ চলছে। তবে, সংবাদমাধ্যমগুলির কাছ থেকে এ-ব্যাপারে যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে।

পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন অব তামিল ইলম নেতা এ সি কণ্ডস্বামী বলেছেন, আততায়ী বলে যে-মহিলাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, সে 'সুধানথিরা পারাভাইগাল' গোষ্ঠীর সদস্যা। এই গোষ্ঠীটি এল টি টি ই-র মহিলা শাখা। তবে, কণ্ডস্বামী আরো বলেছেন, ঐ মহিলা কখনোই এল টি টি

ই নেত্রী জয়ন্তী বা সুন্দরী নয়।

এদিকে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তদন্তকারী অফিসাররা অনুমান করছেন, হত্যাকারী গোষ্ঠীর বিরোধী কোনো সংগঠন সম্ভবত এই ঘটনার আঁচ খেয়েছিল। হত্যাকাণ্ড যাতে না হয়, তার জন্য তারা কিছুটা উদ্যোগও নিয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হবার পর রাজীব গান্ধীকে তার গোপন সূত্রে 'হত্যার চক্রান্ত' সম্পর্কে অবহিত করে। রাজীব কিন্তু পুরো বিষয়টি উড়িয়ে দেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী ঐ সংগঠন চেয়েছিল রাজীব যাতে শ্রীপেরাম্বুদুরে না আসেন। রাজীব তাও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। তদন্তকারী দলগুলি এখন মাদ্রাজের টেলিফোন এবং যোগাযোগের যাবতীয় রেকর্ডগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন এই সংগঠনগুলি সম্পর্কে আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা।

আরো জানা গেছে, এই 'হত্যার চক্রান্ত' সংক্রান্ত খবর রাজীব এবং তাঁর ঘনিষ্ঠমহল একেবারেই গুরুত্ব দেননি; তার কারণ প্রথমত, খবরের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র ছিল না। দ্বিতীয়ত, ছিল না কোনো বিস্তারিত বক্তব্যও। পুরো ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উড়ো বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

অনুমান করা হচ্ছে, এই 'উড়ো খবরের ভিত্তিতেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, রাজীবের শেষ সফরের দু-একজন সঙ্গী চাননি ঐ রাতে রাজীব শ্রীপেরাম্বুদুরে যান। তাঁরা এটাকে নানাভাবে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে আসে বিমানের ত্রুটির বাহানা। তাছাড়া বিশাখাপত্তনমের কালেক্টর রাজীবকে বলেছিলেন, "দয়া করে আজ রাতে আপনি ওখানে যাবেন না। থেকে যান এখানকার সার্কিট হাউসে। কাল সকালেই বিমানের ব্যবস্থা করা হবে। রাজীব তা শোনেননি। এখন প্রশ্ন হল, এঁরা কি সাধারণভাবেই রাজীবকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন? নাকি কোনোরকম বিপদের গন্ধ এঁদের নাকে ছিল? তদন্তকারী দলগুলি এ-ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, কোনো সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচি সম্পর্কে গোপন অন্য কোনো তামিল সংগঠনের আগে থেকে সতর্ক করে দেবার নজির আছে। তবে সেবারও ঐ ফোনকে গুরুত্ব না দিয়ে বিপদ ডেকে আনা হয়েছিল। কিছুদিন আগে মীনামবক্কাম বিমানবন্দরে একটি ফোন আসে। অজ্ঞাতপরিচয় কণ্ঠ জানিয়ে দেয় : 'তুলবশত' বিমানবন্দর চত্বরে একটি ব্যাগের মধ্যে রাখা হয়েছে একটি টাইম বোমা। কর্তৃপক্ষ ফোনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেননি। কিছুক্ষণ পরেই ঘটে যায় বড়োরকম বিস্ফোরণ। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এবারও এরকম একটা কিছু হয়েছে। কোনো সংগঠন সিকিউরিটি এজেন্সিকে রাজীব-হত্যার চক্রান্তের ব্যাপারে অবহিত করার পরও এই খবরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেননি স্বয়ং রাজীবও। গুরুত্ব দিলে হয়তো মর্মান্তিক এই ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো।

তদন্তের কাজ এগোচ্ছে। ২৮ মে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী বলেছিলেন, "আগামী তিন-চারদিনের মধ্যেই হত্যাকারীদের চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।" দু সপ্তাহেও হয়নি। ভারতবাসী, এমনকি যারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এখন আশা করছেন, যত শিগগিরই সম্ভব সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। চিহ্নিত করা হোক তাদের যারা নৃশংসভাবে হত্যা করলো রাজীব গান্ধীকে।

■ প্রতিবেদন শেষ করছি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে। রাজীবের জীবনের শেষ মুহূর্তটিতেও তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুবাই-এর গাল্ফ নিউজের সাংবাদিক নীনা গোপাল। পাঠক, রাজীবের শেষের সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের কথা আপনারা শুনুন সরাসরি নীনার মুখ

তদন্তকারী অফিসাররা এখন খতিয়ে দেখছেন এল টি টি ই-র সঙ্গে দেশের নকশাল গোষ্ঠীগুলির যোগসাজশের ফলেই রাজীব-হত্যা সংঘটিত হয়েছে কিনা। অনুমান, ২০ মে বস্তারে নকশালরা যে বোমাটি দিয়ে আট পুলিসকর্মীকে হত্যা করেছিল, শ্রীপেরামবুদুরেও ব্যবহৃত হয়েছে একই ধরনের বোমা। একাধিক গোপন সূত্র জানিয়েছে এল টি টি ই-র সঙ্গে বস্তারের পিপলস ওয়ার গ্রুপের যোগাযোগ রয়েছে। এদিকে, সম্ভাব্য আততায়ীর ছবি দেখে মিনাক্ষী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের দেওয়া নাম মাড়িমগন আর শঙ্কর দেবনের জানানো নাম মাড়িমোহন—একই লোক কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শঙ্কর দেবন এখন পুলিসের জিম্মায়। চলছে জেরাপর্ব।

থেকেই : হ্যাঁ, উনি নিজেই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। ছিলেন খোশমেজাজেই। ওঁর নির্বাচনী সফরে বেশ কিছুদিন সঙ্গে থেকে আমি দেখলাম, এই গাড়ি চালানো ব্যাপারটা ওঁর কাছে খুব আনন্দের। যখন যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, বসে গেছেন স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে। আমরা যখন শ্রীপেরাম্বুদুরে সেই জনসভার কাছে পৌঁছলাম, তখন সেখানে চলছে বাজি পোড়ানোর ঘটা। চারদিক সব কানফাটা আওয়াজ। অন্ধকার আকাশের বুকে রঙিন আলোর ঝলকানি। রাজীবের মুড ছিল দারুণ। গাড়ি থেকে তিনি নামলেন মুখে সেই হাসিটি নিয়ে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিরাপত্তাকর্মীদের বিশেষ সুযোগ না দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেললেন অনুরাগী কর্মী-সমর্থকরা। অনেকেই তাঁকে মালা, শাল দেন। রাজীব প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাসিমুখে সব-কিছু গ্রহণ করেন।

ভিড়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়ছিলাম আমি এবং আমার মতো আরো অনেকেই। পিছিয়ে পড়ছিলাম না বলে অবশ্য বলা উচিত জনসমুদ্রই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছিল। রাজীবজীর শেষ কথা আমার কানে গেল। উনি মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে ফিরে বলে উঠলেন, "গাল্ফ নিউজের মেয়েটি কোথায় গেল?" গত কয়েকদিনে এরকমভাবে বারবারই উনি আমাকে পিছন থেকে ডেকে নিয়েছেন। চোখাচোখি হল। ইশারায় জানালাম, আমি ঠিক আছি। রাজীবজী মুখ ফিরিয়ে নিলেন হেসে। আর তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কানফাটা আওয়াজ। মনে হল যেন সারা শরীরটা ঝলসে গেল। আমরা তখন মঞ্চ থেকে প্রায় ১০০ ফুট দূরে। বিকট আওয়াজ আর তীব্র ঝলসানিতে চোখ আপনি-আপনি বুজে এল। তবু যেন শেষ মুহূর্তেও দেখতে পেলাম, আমার সামনে কেউ নেই। সব ফাঁকা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কারা যেন পড়ে আছে। আর চাপ চাপ রক্ত।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেল। বুঝতে পারলাম বোমা ফেটেছে। আমার সামনে তখন ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহ আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ততক্ষণে রীতিমতো দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে। আতঙ্কের ছায়াটা মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে নিয়েছে পুরো পরিবেশকে। অসহায়ের মতো দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলাম কয়েকজন পুলিসকর্মীকে। চকিতে মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল—রাজীবজী কোথায়। ডানদিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর প্রেস সচিব সুমন দুবে। বললাম, "ঐ ভিড়ের মধ্যে থেকে আগে রাজীবজীকে খুঁজে বার করুন"। তখনো ভাবতে পারিনি বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন তিনি।

এরপর নজর গেল ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহগুলির দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, পা-দুটি রাজীবজীর। পেট থেকে আর চেনার উপায় নেই। আর মাথা? ওঃ ! আমার পক্ষে আর মনে করা সম্ভব নয়। এরপর জয়ন্তী নটরাজনকে দেখতে পেলাম। রাজীবজীর ঐ ছিন্নভিন্ন শরীরটা বার করে আনার চেষ্টা করছেন। এসে গেলেন আরো কয়েকজন। আমার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল এমনিতেই। হাত-পা কাঁপছিল। কোনোক্রমে সরে এলাম গাড়ির কাছে।

আজ এখনো চোখের সামনে ভাসছে রাজীবজীর মুখ। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, হেসে খুঁজছেন আমাকে—হোয়্যার ইজ দ্যাট 'গাল্ফ নিউজ' গার্ল ?

তথ্য : নয়াদিল্লি থেকে ডি মেনন, কলম্বো থেকে জয়সূর্য বিজয়রত্নে, অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স, নয়াদিল্লি ইন্সটিটিউট অফ ফরেনসিক রিসার্চ, মাদ্রাজ।

'অপরাধপ্রবণ রাজনীতির শিকার' ঃ বসু

প্রয়াত রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্পর্কটি ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নানা রাজনৈতিক বিষয়ে জ্যোতিবাবুর পরামর্শ নিতেন রাজীব। বিভিন্ন সময়ের সাক্ষাৎকারে জ্যোতিবাবু রাজীব সম্পর্কে অনেক না-বলা কথা জানিয়েছেন। সঙ্কলন করেছেন স্বরূপ বিশ্বাস।

বয়স আর অভিজ্ঞতার ব্যবধান প্রায়ত্রিশ বছর। তবুও দেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের অন্যতম দুই কর্ণধারের সময়ে-অসময়ের বহু সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা সচেতন মানুষের মনে কখনো গভীরভাবে, কখনো-বা একটু হাল্কা ধরনের ছাপ ফেলেছিল। আদর্শগতভাবে পরস্পরবিরোধী এই দুই রাজনৈতিক দলের দুইঅন্যতম কর্ণধারের আলাপ-আলোচনার বহু মন্তব্যই অনেক সময়ে তাঁদেরই দলের মধ্যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কখনো বা দেশ ও তার এক রাজ্যের কর্ণধার হিসাবে, কখনো-বা এই দুই দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় কখনো তাঁরা মূল বিষয়ে একমত হয়েছেন, কখনো হতে পারেননি। কিন্তু তবুও বিভিন্ন ইস্যুতে মাঝে-মধ্যেই তাঁদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেমে থাকেনি। প্রবীন আর নবীনের এই সম্পর্ক নিয়ে তাই মাঝে মধ্যেই উঠেছে চাপা গুঞ্জন। দু'দলেরই কেউ না কেউ কখনো প্রকাশ্যভাবে কখনো আড়ালে এ-নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। প্রবীনের প্রতি নবীনের এই সম্পর্কের পিছনে সত্যিই কি ছিল কোনো আন্তরিক শ্রদ্ধার টান? এ নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে বারবার। নবীনের মা, যিনিও একসময় ছিলেন এই দেশের কর্ণধার, তাঁর সঙ্গেও এই প্রবীণের দেশের বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা বহু সময়ে দেশের সংবাদের শিরোনামে এসেছে। মার সঙ্গে প্রবীণের দেশের বহুসমস্যা সমাধানে এইসব যৌথ উদ্যোগই সম্ভবতঃ এই নবীনকে ঐ প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে সহায়তা করেছে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, দেশবিরোধী এক কুচক্রের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে এই মাতা-পুত্রকে। দুটি পৃথক ঘটনায় বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে মাতা ও পুত্রকে দুটি চাঞ্চল্যকর, নির্মম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে আলোচ্য ঐ প্রবীণ ব্যক্তিটি আর কেউ নন। তিনি হলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। আর নবীন ব্যক্তিটি হলেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী। আর তাঁর মা প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। রাজনৈতিকভাবে শত মতবিরোধ সত্ত্বেও মাতা-পুত্রের দুটি পৃথক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেই নিন্দায় ও প্রতিবাদে জ্যোতিবাবু ছিলেন মুখর। দু'বার দু'জনেরই নিহত হওয়ার খবর তিনি পান মাদ্রাজে। সম্প্রতি কলকাতার মহাজাতি সদনে বামফ্রন্ট আহূত রাজীবগান্ধী স্মরণসভায় শোকজ্ঞাপন করতে গিয়ে স্বয়ং জ্যোতিবাবুই এ খবর জানান। রাজীব হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরেই মাদ্রাজে বসে জ্যোতিবাবু এই

খবরটি পেয়ে ভেঙে পড়েন।

জ্যোতিবাবুর প্রতি রাজীব গান্ধীর যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, একথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনার মাঝে তাঁর আচরণেই তা প্রকাশ পেত বলে জ্যোতিবাবু মনে করেন। তাঁর মা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনার ঘটনাগুলিই তাঁর এই আচরণে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে শ্রী বসু মনে করেন।

অতীতে দার্জিলিঙে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা সমাধানে প্রয়াত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সত্যিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রকৃত সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জ্যোতিবাবু একথা স্বীকার করেছেন। জ্যোতিবাবু বলেছেন, রাজীব গান্ধী এই সমস্যা সম্পর্কে বুঝেছিলেন এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, সারা দেশের সমস্যা। এই অংশ যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তার প্রতিক্রিয়া সারা দেশে, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চল ও উত্তরপ্রদেশে প্রভাব বিস্তার করবে। তাই যৌথভাবে এই সমস্যা সমাধানে তিনি প্রকৃত একজন সাহায্যকারী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জ্যোতিবাবুর অতীতে দীর্ঘক্ষণ সাক্ষাৎ ঘটে, তা হল 'পঞ্চায়েতরাজ' বিল। ক্ষমতাসীন থাকার শেষ পর্যায়ে এসে রাজীব গান্ধী এই বিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও জ্যোতিবাবু কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এই বিল নিয়ে দু'জনের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনাও হয়। জ্যোতিবাবুর পরামর্শে এ-ব্যাপারে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে একটি আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করতেও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধী এখানে আসেন। এ বিষয়ে তিনি খুব ভালো বক্তব্যও রেখেছিলেন বলে জ্যোতিবাবু স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবুও বিলটি সম্পর্কে তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ হয়। জ্যোতিবাবুর মতে, বিলটিতে বিকেন্দ্রীকরণের চেয়েও কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য ছিল অনেক বেশি। ভূমিসংস্কার পঞ্চায়েতরাজের প্রধান অঙ্গ। এটা ছাড়া পঞ্চায়েত প্রবর্তনের কোনো অর্থই হয় না। উল্লেখ্য, এরপর অবশ্য রাজীব গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হন।

এ-রাজ্যের সমস্যা সমাধানে এবং দারিদ্যদূরীকরণে কেন্দ্র কিছুই করছে না, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধী বিগত ১৯৮৭ সালে একবার কেন্দ্রীয় সরকারের সব অফিসারদের নিয়ে কলকাতায় আসেন।

রাজ্য সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি বসে তিনি অভিযোগের বিহিত করবেন ও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত নেবেন। ঐ সময় এ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সমস্যা সমাধানে তিনি ১০০১ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যান। যদিও তাতে কোনো কাজ হয়নি বলে জ্যোতিবাবু মন্তব্য করেছেন।

নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে বিরোধী দলনেতা হিসাবে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে শ্রী বসুর একাধিকবার সাক্ষাৎ ঘটেছে। বহুবার এইসব সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা আহারও সেরেছেন

একসঙ্গে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গ নিয়ে কখনো রাজীব গান্ধী, কখনো-বা জ্যোতিবাবু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে একে অপরকে টেলিফোন করে কথাবার্তা বলেছেন। শুধু তাই নয়, বিদেশনীতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে একাধিকবার। বিশেষত উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালীন এ প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। জ্যোতিবাবু জানিয়েছেন, এ-ব্যাপারে আলোচনার সময় এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর সমর্থিত চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করেছিলেন রাজীব গান্ধী। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে ঐ সময় ইরান ও সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধী দলনেতা হলেও ভারতের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে তাঁর (রাজীব গান্ধী) এই উদ্যোগকে তাঁরা (জ্যোতিবাবুরা) স্বাগত জানিয়েছিলেন।

শ্রী বসু জানিয়েছেন, বিদেশনীতি প্রসঙ্গে বেশ-কিছু বিষয়ে তাঁদের দু'দলের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও অর্থনৈতিক নীতির কিছু বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পারেন কিনা—এ প্রস্তাব রাজীব গান্ধী তাঁদের দিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা তাঁকে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর এই আর্থিক নীতির ঘোরতর বিরোধী। সংশোধিত আর্থিক নীতির একটি নতুন খসড়া যা তিনি তৈরি করেছেন, তাঁদের (জ্যোতিবাবুদের) দলে আলোচনার জন্য তা পাঠাবেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানাবেন। কিন্তু সেই খসড়া শেষপর্যন্ত তাঁদের (জ্যোতিবাবুদের) কাছে এসে পৌঁছয়নি।

জনতা দলকে ভেঙে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে চন্দ্রশেখরকে সরকারে বসানোর বিষয়ে রাজীব গান্ধীর ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন জ্যোতিবাবু। প্রকাশ্যেই তিনি রাজীবকে বলেছিলেন, এটা কোনো সৎ উদ্দেশ্য নয় বা কোনো পরিচ্ছন্ন রাজনীতির পরিচয় নয়। উত্তরে রাজীব তাঁকে বলেছিলেন, এই মুহূর্তে তিনি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নন। এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। কারণ এই মুহূর্তে দেশে নির্বাচনের অর্থই হল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ইন্ধন যোগানো। সাম্প্রদায়িকতাই এখন ভারতের সবথেকে বড় বিপদ বলে তিনি মনে করেছিলেন। যদিও জ্যোতিবাবু তাঁকে বলেছিলেন, তিনি এর বিরুদ্ধে কথা বললেও তাঁর দলের লোকেরা, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসিরা এর বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না। রাজীব কিন্তু এ-ব্যাপারে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে, এটা বি.জে.পি-র নীচতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। তিনি অবশ্য জানেন না, দেশে কী ঘটতে চলেছে।

রাজীব তাঁকে বলেছিলেন, ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। দিনে-দিনে ভারত পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আমেরিকা সবার মাথায় চড়ে বসছে। বিশেষত উপসাগরীয় যুদ্ধের পর। যদিও আমেরিকা

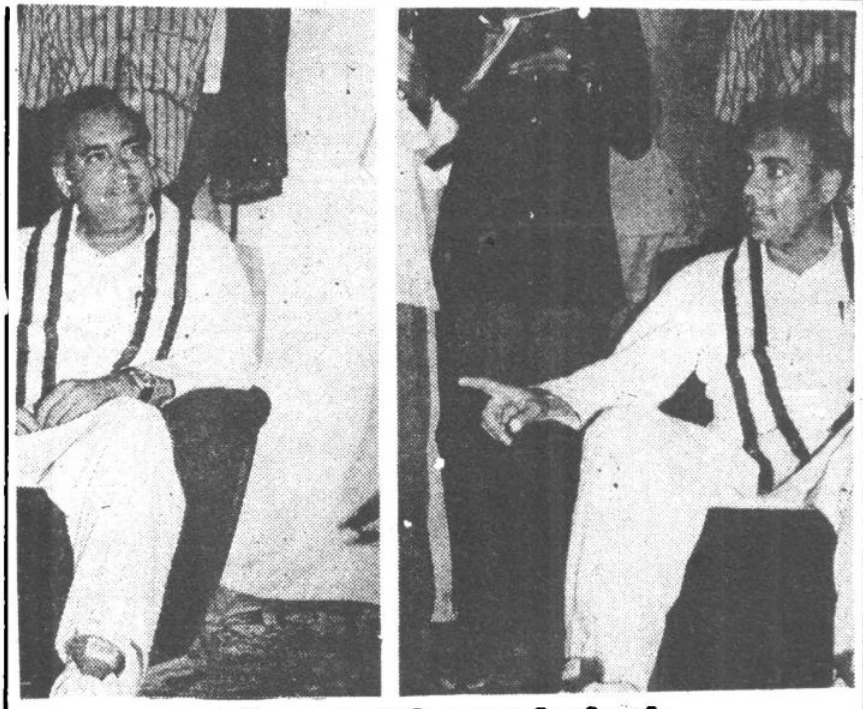

শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাজীব গান্ধী।

সবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলবে—এ বিষয়ে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। আমেরিকাকে বাদ দিয়ে আর কী-কী ভাবে দেশের অর্থ সংস্থান করা যায় তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু আলোচনাও হয়। ঐ সময় রাজীব-সরকার গড়তে জ্যোতিবাবুদের সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে জ্যোতিবাবু সায় দিতে পারেননি।

নিহত হওয়ার প্রায় একমাস আগে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর শেষ কথাকর্তা হয় টেলিফোনে। বিষয় পাঞ্জাব নির্বাচন। দিল্লি থেকে টেলিফোনে রাজীব তাঁকে জানান, এখন ঐ নির্বাচনের তাঁরা ঘোরতর বিরোধী। এ বিষয়ে একমতও হন জ্যোতিবাবু। স্থির হয়, এ-নিয়ে দিল্লিতে তাঁরা দলীয় স্তরে কথাও বলবেন। কিন্তু তারপরই হঠাৎ দিল্লিতে রাজীব ঘোষণা করেন, তাঁর দল ঐ নির্বাচন বয়কট করবে।

রাজনীতিতে পদার্পণের শুরুতেই রাজীবকে রাজনৈতিক দিক থেকে অনভিজ্ঞ ও দুর্বল মনে হলেও দ্রুত তিনি তা কাটিয়ে উঠছিলেন—'একথা স্বীকার করে জ্যোতিবাবু বলেছেন, প্রথমদিকে তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু বিতর্কিত বিবৃতি দিলেও, বিরোধী দলনেতা হিসাবে তাঁর বক্তব্য ছিল গঠনমূলক। এ বিষয়ে রাজীব অবশ্য তাঁর প্রথমদিকের অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করে তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তখন ছিলেন নবাগত।

জ্যোতিবাবু বলেছেন, এর প্রমাণ হল, এবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী সফরে এসে রাজীব কিন্তু আগের সুরে কথা বলেননি। অনেকেই তাঁকে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে বলবার জন্য উৎসাহিত করলেও তিনি অবশ্য তাঁদের বলেছেন, এ বিষয়ে তাঁরাই ভালো জানেন, তিনি কিছু বলবেন না। শ্রী বসুর মতে, এটা ছিল তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিনম্র উত্তর।

জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী ও সবশেষে রাজীব গান্ধী—এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক সময়ের সঙ্গে রাজনীতিতে যুক্ত আছেন জ্যোতিবাবু। তাঁর অভিজ্ঞতায় ইতিহাস কীভাবে রাজীব গান্ধীর মূল্যায়ন করবে সে-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, রাজীবের সময়ের পরিধি ছিল বড়ই অল্প।

অনভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের জন্য পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তাঁর নীতিগ্রহণ ও রূপায়ণের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। কিন্তু প্রত্যেকেরই কিছু শিক্ষণীয় থাকে আর সে জন্যই বিরোধী দলনেতা হিসাবে নিঃসন্দেহে তিনিও কিছু শিক্ষা নিতে পেরেছিলেন।

সবশেষে, রাজীব গান্ধীর এই নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশের পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের ইঙ্গিত—এ আশঙ্কায় শ্রী বসু বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধী হত্যার সময়েও তাঁরা বলেছিলেন এর পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত, যারা ভারতকে ভাগ করতে চায়, নষ্ট করতে চায় ভারতের স্থায়িত্ব। কিন্তু এর ষড়যন্ত্রের পিছনে কারা, সেই রহস্যের প্রকৃত কিনারা আজও করা যায়নি এবং তা প্রকাশও পায়নি। রাজীবের ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। প্রশ্ন জেগেছে, এবারও কি ঐ রহস্যের কোনো কিনারা হবে? সকলেই জানেন, বহু অশুভ শক্তির লক্ষ্য ছিলেন তিনি। যা ঘটল, তা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই মারাত্মক। এই হিংসাপ্রবণতা, যা প্রকৃতপক্ষেই গভীর উদ্বেগের। অপহরণ, হিংসা, গুপ্তহত্যা—এসবই 'অপরাধপ্রবণ রাজনীতি' ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষ রাজীব গান্ধী

রাজনীতির আবর্তের বাইরে অন্য রাজীব গান্ধীকে নিয়ে ***জয়ন্ত চক্রবর্তীর*** *প্রতিবেদন।*

আমেরিকার ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি একবার তাদের একটি টেলিভিসন ইন্টারভিউতে রাজীব গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিল—আপনি আপনার পরিবারের জন্য ঠিক কতটা সময় ব্যয় করেন? রাজীব তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এন বি সি-র প্রাইম-টাইম স্লটে এই সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হয়েছিল। লক্ষ-লক্ষ দর্শক উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন যে ভারতের সুদর্শন এবং তরুণ প্রধানমন্ত্রী কি জবাব দেন। রাজীব জবাবটি এইভাবে দিয়েছিলেন—"আমরা ভারতবাসীরা সবাই মিলেই একটা পরিবার। সুতরাং ধরেই নিতে পারেন যে আমার সময়ের প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয় এই পরিবারের জন্য।। আলাদাভাবে নিজের পরিবারকে সময় দেবার কোনো প্রশ্নই থাকে না। কারণ ভারতের আদর্শই হল একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ। এখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভাবার অবকাশ নেই।" ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ্য জবাব এন বি সি-কে দিলেও রাজীব গান্ধী যে তথ্যটি সম্পূর্ণ আড়াল করে গিয়েছিলেন মার্কিন টেলিভিসন সংস্থাটির কাছে সেটি হল রাজীব গান্ধী নামক মানুষটি আদতে একজন পারিবারিক মানুষ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তাঁর অন্য পরিচয় আছে। কখনো তিনি সোনিয়া গান্ধীর স্বামী। কখনো রাহুল-প্রিয়াংকার বাবা। প্রধানমন্ত্রী অথবা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সভাপতি যাই হোন-না কেন রাজীব আলাদাভাবে স্বামী এবং পিতার পরিচয় নিয়েও থাকতে চেয়েছিলেন। যখন ইন্দিরা গান্ধী জীবিত ছিলেন তখন এবং পরেও রাজীব নিজের পরিবার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের ক্রোড়পত্রে রাজীব একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"অনেক কাজের মধ্যে আমি যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন ইচ্ছা করে হয়

এভাবেই বারবার হাজির হয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মাঝখানে।

একাট পছন্দসই এয়ারক্র্যাফট নিয়ে বাতাসে ভেসে পড়ি। ছুঁয়ে আসি দূরের ওই স্বপ্নময় নীলিমা কিংবা রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে দুরং..্লার কোনো সাফারিতে চলে যাই। হ্রদের জলের পাশে ওরা ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াক। আমি বসে বসে চেয়ে দেখি। কিন্তু আমি জানি এ-দুটোই এখন অসম্ভব। ইচ্ছা করলেই আমি এখন প্লেন নিয়ে বাতাসে ভাসতে পারি না কিংবা রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে জয়—রাইডিংয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি না। আমি এখন নিয়মের নিগড়ে বন্দী।"

শুধু চেহারায় নয়, রাজীব গান্ধী মানসিকতায় যে রোমান্টিক ছিলেন ওপরের কথাগুলোই তার প্রমাণ। অবশ্য রোমান্টিক না হলে দেশ থেকে দূরে প্রবাসে, পরবাসে তিনি সোনিয়ার প্রেমে পড়বেনই-বা কেন? রাজীব-সোনিয়ার প্রেমকাহিনী ইদানীং প্রায় কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে। বিশেষত রাজীবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সাময়িকপত্র কিংবা খবরের কাগজ প্রায় হিন্দি ফিল্মের নায়ক-নায়িকার মিলন-কাহিনীর মতো রাজীব-সোনিয়ার প্রেম-পরিণয়েরব্যাপারটিকে তুলে ধরেছে। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটি এতখানি রঙিন ছিল না। রাজীব কেমব্রিজে গিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি ডিপ্লোমা-কোর্স করতে। সোনিয়া কেমব্রিজের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে 'ইনটারপ্রেটার' হবার জন্য পড়াশোনা করছিলেন। কেউ-কেউ বলেন যে, কেমব্রিজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গেট-টুগেদারে রাজীব-সোনিয়ার প্রথম দেখা হয়। আবার অনেকের ধারণা যে, লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একটি "পাবে" (পাবলিক বার—অনেকটা আমাদের কফি হাউস ধাঁচের) এক কমন বন্ধুর মারফত রাজীব-সোনিয়ার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রাজীব-সোনিয়ার প্রেমের ব্যাপারটা লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে চালা..ার একটা চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনাটা কিন্তু আদপেই তাই ছিল না। রাজীব-সোনিয়ার প্রথম দেখার পর দুজনে মাঝে-মধ্যেই একে অপরকে "ডেট" করতে থাকেন। ব্যাপারটা মোটেই সোজা ছিল না। জওহরলাল নেহরুর নাতি, ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীবের ওপর ছিল ভারতীয় অফিসারদের তীক্ষ্ণ নজর। না, রাজীবের অভিভাবকত্ব করার জন্য নয়, প্রচারের সন্ধানী আলো নেহরু-গান্ধী পরিবারকে যাতে এতটুকু বিবর্ণ করতে না পারে তার জন্য লন্ডনস্থ ভারতীয় অফিসারদের ছিল কড়া নজরদারি। সোনিয়ার পক্ষেও রাজীবের সঙ্গে কোর্টশিপ চালাবার ব্যাপারে অন্য সমস্যা ছিল। রাজীবের মতো বিরাট পটভূমিকা কিংবা আভিজাত্য সোনিয়ার ছিল না। ইতালির বিশ্ববিখ্যাত ফিয়াট গাড়ির উৎপাদন যে শহরে হয় সেই তুরিনের বাসিন্দা সোনিয়া মাইনো ছিলেন অন্যান্য ইতালিয়ান মেয়েদের মতোই সহজ-সরল এবং অনাড়ম্বর। তবে অন্য ইতালিয়ান মেয়েদের মত প্রাণোচ্ছলতা সোনিয়ার ছিল না—তিনি ছিলেন কিছুটা ইন..ভার্ট। স্বভাবতই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে রোমান্স চালাবার ব্যাপারে সোনিয়া কিছুটা সংকুচিত ছিলেন। কিন্তু সংকোচের সব অবরোধ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সঞ্জয় গা... মক এক টাইফুন। লন্ডনে এসে রাজীবকে সোনিয়ার প্রতি অনুরক্ত দেখে সঞ্জয় রীতিমতো হইচই বাধিয়ে দিলেন। উইক এন্ডে রাজীব-সোনিয়ার দেখা হত—সঞ্জয়ের চেষ্টায় ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াল একদিন, প্রতিদিনে। রাজীব, সঞ্জয় এবং সোনিয়ার প্রতিটি সন্ধ্যা হয়ে উঠল রমনীয়, সুন্দর। অপেরা, থিয়েটার, স্টেজ-শো আর লন্ডনের বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিতে নিয়মিত যেতে লাগলেন ওঁরা। লন্ডনের খবরের কাগজের পাড়া ফ্লিট স্ট্রিটে আলোড়ন ওঠার আগেই ইন্দিরা গান্ধী নিজে নিয়ন্ত্রণ নিলেন এ-ব্যাপারে। লণ্ডনে একটি সফরে এসে ইন্ডিয়া হাউসে তিনি ডেকে পাঠালেন সোনিয়াকে। ইন্দিরার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি সোনিয়া বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষ্যে। এবার দেখা যাক সোনিয়া কি বলেছেন—"সেদিন সকাল থেকেই আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছিল। খবরের কাগজে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিষয়ে নানাকথা পড়া ছিল। কিন্তু তাঁর মুখোমুখি হওয়াটা! রাজীব অবশ্য আমাকে বলেছিলেন যে তাঁদের মা-ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বন্ধু.. মতো। আমার ভয় করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু তবু ইন্দিরা গান্ধী বলে কথা। আমি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছিলাম। আমার মনে আছে প্রথমে ঘরে ঢুকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ছটায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আর রূপ? আমার কলমের এত শক্তি নেই যে তাঁ. মহিয়সী রূপের বর্ণনা আমি করব। চমৎকা. একটি হাসি দিয়ে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সস্নেহে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। এই স্নেহ থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি বঞ্চিত হইনি। আমার পোশাকের এমব্রয়ডারির একটা কোণ ছিঁড়ে গিয়েছিল। ওঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। নিজের হাতে তিনি ছিঁড়ে-যাওয়া অংশটি সেলাই করে দিয়েছিলেন। আমি সেদিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছিলাম পাখির ডানায় ভর করে।"

ইন্দিরা গান্ধীর দিক থেকে রাজীব-সোনিয়ার বিয়ের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উঠল না। আপত্তি এল মাইনো-পরিবার থেকে। একজন বিদেশীকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপত্তি তুললেন সোনিয়ার বাবা। শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে, সোনিয়া বিয়ের আগে একবার ভারত ভ্রমণে যাবেন। ভারতীয় কালচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কিনা সেটা খতিয়ে দেখবেন। সেইমতো সোনিয়া ভারতে এলেন। উঠলেন অমিতাভ বচ্চনের মা তেজী বচ্চনের বাড়িতে। সেই থেকে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে সোনিয়ার ঘনিষ্ঠতা। সোনিয়ার নিজের ভাষায়—"আমার নিজের মা ছাড়া আমার দ্বিতীয় মা হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তৃতীয় মা শ্রীমতী তেজী বচ্চন।" ভারতীয় জীবন এবং সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে সোনিয়া বিশেষ সময় নেননি। এরপর আর আপত্তি ওঠেনি মাইনো-পরিবার থেকে। ১৯৬৮ সালে রাজীব-সোনিয়ার বিয়ে হয়। রাজীব সম্পর্কে সোনিয়া তাঁর বক্তব্যটি বিয়ের কয়েক বছর পরে জানান এইভাবে—"আমি জানি রাজীব অত্যন্ত সুদর্শন। মেয়েরা নিঃসন্দেহে এইরকমের পুরুষকেই পছন্দ করে। কিন্তু রাজীবের চেহারার থেকেও আমার বেশি পছন্দ ছিল রাজীবের মনটা। বহতা নদীর মতোই স্বচ্ছ ছিল রাজীবের মন। উদার, নিরহঙ্কার এবং নির্মল হৃদয়ের এই মানুষটি আমার মন জয় করে নিয়েছিল কেমব্রিজে পড়ার দিনগুলিতে।"

রাজীব রাজনীতিতে আসুন সোনিয়া কোনোদিনই চাননি। রাজীবের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলটের চাকরি নিয়ে সোনিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজীব রাজনীতিতে যোগ দিলে সোনিয়া তাঁকে ডিভোর্স করবেন—এমন কথাও বলেছিলেন। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে আসতে হল রাজীবকে। অবশ্য সোনিয়ার অনুমোদন নিয়েই রাজীব রাজনীতিতে এসেছিলেন। এই রাজনীতিই রাজীবের জীবনে দাঁড়ি টেনে দিল—অকালে।

কেমন মহিলা সোনিয়া? বিয়ের পর রাজীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাই-বা কেমন ছিল? এইসব প্রশ্ন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর কল্পকাহিনী বাজারে ছড়িয়েছে—যার অধিকাংশেরই কোনো ভিত্তি নেই। আসলে তুরিনের ইতালিয়ান মেয়েটি রাজীবকে বিয়ে করার পর মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসের ছাত্রী সোনিয়ার পক্ষে হিন্দি শিখে নেওয়াটা খুব কঠিন হয়নি। ভারতীয় জীবনধারা এবং ভাবাদর্শটিও তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করে' নেন। ফলে গান্ধী-নেহরু পরিবারে মিশে যাওয়াটা খুব কঠিন হয়নি সোনিয়ার পক্ষে। ইন্দিরা গান্ধীর খুব কাছে চলে এসেছিলেন সোনিয়া। সঞ্জয়ের স্ত্রী মানেকা যা পারেননি সোনিয়া তাই পেরেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছিলেন সোনিয়া। আসলে সোনিয়া শুধু রাজীব গান্ধী নয়—পুরো গান্ধী পরিবারটিকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সে-কারণে তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এই পরিবারের সঙ্গে। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর মানেকা যখন গান্ধী পরিবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তখন প্রচণ্ড আঘাত-পাওয়া ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সোনিয়াই। ইন্দিরার মৃত্যুর পর রাজীবের পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ ছিলেন সোনিয়া। সোনিয়াকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন যে, সোনিয়ার আপাত-কঠিন আবরণের নিচে কুসুম-কোমল একটি মন আছে। অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি এবং বিমূর্ত শিল্পকলার সমঝদার সোনিয়াকে প্রায়ই দেখা যেত দিল্লির মিউজিয়ামগুলিতে। পরিবারের

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটি সোনিয়া নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এমনকি রাজীব কতটা মিষ্টি খাবেন দিনে তার দিকেও থাকত সোনিয়ার প্রখর নজর। সাউথ ব্লকে প্রাইম-মিনিস্টারস অফিসে রাজীবের পারসোনাল টেলিফোনটি প্রায় বেজে উঠত। সোনিয়া রাজীবকে মনে করিয়ে দিতেন প্রয়োজনীয় ওষুধ কিংবা অন্য কিছু খাওয়ার ব্যাপারটি। সোনিয়া কি রাজীবের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন? এ-ব্যাপারে দু'জনের প্রচুর রটনা আছে। কেউ বলেন যে, সোনিয়া পছন্দ করতেন না বলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিলেন। ইতালিয়ান কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী বাড়তি সুবিধাও পেয়েছেন সোনিয়ার বদান্যতায়—এমন রটনাও আছে। বাস্তবে ব্যাপারটি কিন্তু ছিল অন্যরকম। রাজীবের রাজনীতিতে একেবারেই মাথা গলাতেন না সোনিয়া। ছোটবেলা থেকে মাফিয়া-অধ্যুষিত ইতালিয়ান রাজনীতি দেখে-দেখে বিষয়টি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন সোনিয়া। রাজীবের রাজনীতি করাটাও এই কারণেই না-পসন্দ ছিল তাঁর। অথচ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব দেশের প্রধানমন্ত্রী-পদে আসীন হলে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোনিয়াকে "পাবলিক-লাইফে" আসতে হয়। যদিও চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত প্রাইম-মিনিস্টার নিজের পরিবারে এবং সন্তানদের জন্য সময় দিন—এটাও চাইতেন সোনিয়া। রাজীব প্রধানমন্ত্রী হবার পর তাঁর পাশে যে কিছু স্বার্থ-সচেতন মানুষের ভিড় হচ্ছে এটা সোনিয়াই প্রথম বুঝতে পারেন এবং রাজীবকে এ-ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

রাজীব তাঁর পরিবারের লোকদের নিয়ে মাঝে-মধ্যেই, অন্তত দু'বছরে একবার ছুটি কাটাতে চলে যেতেন নির্জন কোনো দ্বীপে অথবা সমুদ্রসৈকতে। লাক্ষাদ্বীপে একটি অক্টোপাসের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন রাজীব—এই নিয়ে বিরোধীরা দেশজুড়ে কম ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় বইয়ে দেননি। সম্ভবত সবাই ভুলে গিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীত্ব অথবা কংগ্রেস সভাপতির খোলসের বাইরে রাজীব একজন মানুষ। তাঁরও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-ভালোবাসা থাকতে পারে। মানুষ-রাজীবকে যখন আমরা আবিষ্কার করলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাদ্রাজের পেরুমপুদুরে ঘাতকের বোমা রাজীব গান্ধীকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল একটি যুগ। ■

নিরাপত্তার ঘেরাটোপ এবং রাজীব-হত্যা

রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপটি কেমন ছিল—জানিয়েছেন অভিজিত মুখার্জি।

চমকে উঠলেন ডাক্তাররা। অপারেশন টেবিলে যে প্রাণহীন দেহটি পড়ে আছে, সেটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ৯টা। দেহ না বলে একে মাংসপিণ্ডই বলা উচিত। দেহের বাঁদিক বিস্ফোরণে প্রায় উড়ে গেছে। শুধু ডান কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে মাথার খুলির পিছনের অংশটুকু। এইসব ভারতবিখ্যাত শল্যবিদ্‌দের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জনপ্রিয় এই নেতার দেহকে অন্তত দর্শনযোগ্য করে তুলতে হবে। সাধারণত যা সময় লাগে তার চেয়ে বহুক্ষণ বেশি প্রচেষ্টাতেও শল্যবিদেরা বিফলকাম হলেন। হাঁটু থেকে শরীরের নিম্নাংশ মোটামুটি যথাযথ আছে। যে মুখে প্রশংসা-সমালোচনা—সবেতেই একটা স্মিতহাসি লেগেই থাকত, সেটি এখন শুধু একতাল মাংস। বাঁ-চোখের একটু অংশ, বাঁগাল আর সামান্য একটু ঠোঁট ঝুলে আছে। হাতের আঙুলগুলো নেই, হাতের সবক'টি হাড়ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বুক থেকে কোমর অবধি বিশাল এক গহ্বর—ফুসফুস, অন্ত্র বেরিয়ে এসেছে দেহের বাইরে। কোনোমতে সেই গহ্বরকে সেলাই করা হল।

প্রাণহীন শরীর এ আই আই এম এস-এ পৌঁছতে-না-পৌঁছতে কিছুটা পচন শুরু হয়ে যায়। সুতরাং বেশিমাত্রায় শরীরে রেক্টিফায়েড স্পিরিট ও ফর্মালিন ইনজেক্ট করা হল। এই স্পিরিট ও ফর্মালিন দেহটিতে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে অবিকৃত রাখবে। সমস্ত দেহটিতে এবার ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা হল। শল্যবিদ্‌দের শত চেষ্টাতেও মুখ সম্পূর্ণ বিকৃত ও চেনার অযোগ্য—তাই মুখটিকেও ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। শৈত্যপ্রভাবে দেহকোষগুলিকে ঠাণ্ডা রেখে দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শরীরের নিচে সিন্থেটিক ফাইবার জাতীয় 'ক্রিয়োসোট'-এর কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হল।

খবরের কাগজ, দূরদর্শন, বেতার ইত্যাদির কল্যাণে হয়তো অনেকেই জানেন, বোমা বিস্ফোরণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শরীর কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁর কুর্তা ও জুতোয় তাঁকে শনাক্তকরণ সম্ভব হয়—এও আমরা জানি। অনতি অতীত স্মৃতিকে কিছুটা কালিয়ে নেবার জন্যই এই আনুপূর্বিক

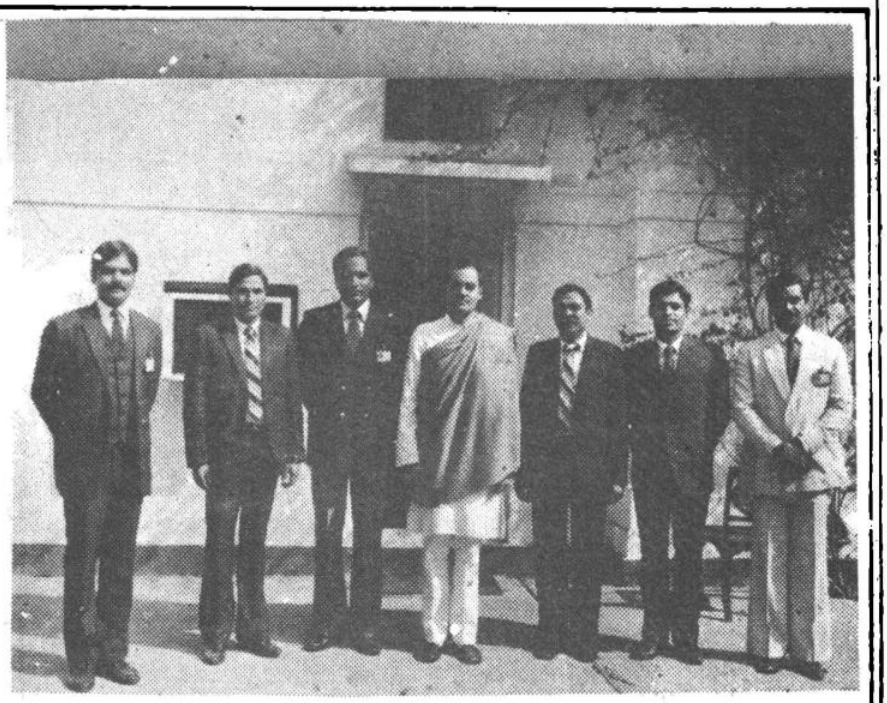

ব্ল্যাক-ক্যাটদের ইনার-রিং। এই ছ'জনই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাজীবের মূল নিরাপত্তা-রক্ষী ছিলেন।

বিবরণ।

১৯৪৮, ১৯৮৪, ১৯৯১—ভারতীয় জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে মহাত্মা, ইন্দিরা, অধুনা রাজীব বলি হয়েছেন অন্ধ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার। গুপ্তহত্যার সন্ত্রাসবাদ বেশ জাকিয়ে বসেছে ভারতবর্ষে। হিটলিস্ট, VVIP—নিরাপত্তা এই শব্দগুলির সঙ্গেও আমরা বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছি।

শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও গুপ্তহত্যা তথা রাজনৈতিক হত্যা চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উল্লেখযোগ্য বেশ-কিছু রাজনৈতিক নেতাকে বলি হতে হয়েছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের। যেমন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হোসনি জায়েম (আগস্ট, ১৯৪৯), জর্ডনের রাজা আবদুল্লা (জুলাই, ১৯৫১), আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি (নভেম্বর, ১৯৬৩), বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমান এবং জিয়াউর রহমান (আগস্ট, ১৯৭৫ ও মে, ১৯৮১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ১৯৪৮ থেকে ১৯৯১ আবধি সাতবার প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে—দু'বার স্বাভাবিক মৃত্যু, তিনবার ব্যালটের রায়। ১৯৮৪-তে বুলেট প্রধানমন্ত্রী বদল করেছে, এক বোমা বিস্ফোরণ হয়তো বা ভাবী এক প্রধানমন্ত্রীর জীবনে অকালে যবনিকা টেনে দিয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীতীরে' নামে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্পটির নায়িকা ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং। তিনি গঙ্গার ধারে একা যেতে চান, সেই সময় তাঁকে তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়। সব সময়েই আমাকে একজন কেউ হত্যা করতে চায়, এই চিন্তা কেমন লাগে—প্রশ্ন তাঁকে। জবাব সব সময় মনে থাকে না। আবার প্রশ্ন—সব সময় নিরাপত্তাসঙ্গী থাকা মানেই তো চেতনে হোক অবচেতনে, হোক এটা মেনে নেওয়া। উনি বললেন—সব অভ্যেস হয়ে যায়। এটাও পার্ট অব দ্য গেম।

অথচ নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ৩টি বুলেট মহাত্মাকে কেড়ে নিল ভারতবর্ষ থেকে। সতবন্ত, বিয়ন্ত ২২টি বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে।

অথচ তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তো আপাত কোনো ত্রুটি ছিল না। 'অপারেশন ব্লু-স্টার' হয়ে যাবার পরও শ্রীমতী গান্ধী কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়কে বিদ্বেষে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে কনস্টেবল সতবন্ত ও সাব-ইন্সপেক্টর বিয়ন্তকে সরিয়ে দেবার প্রস্তাবে তাই তিনি কর্ণপাত করেননি। আপাদমস্তক একটি অসাম্প্রদায়িক মানুষই বুঝি এমন করতে পারেন। ভিতর বাড়িতে তাদের ঢোকার কথাই নয়, অথচ দুজনেই নিজেদের ইচ্ছামতো ডিউটি বদল করেছিল। ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর নিজের বাসভবনে নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত, সেই দেহরক্ষীরাই অপ্রস্তুত নিরস্ত্র এক নারীকে রিভলবার, স্টেনগান চালিয়ে ঝাঁঝরা করল। অথচ এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে মারার ষড়যন্ত্র ব্রিটিশ পুলিস ব্যর্থ করে দেয়।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে ১ নং সফদরজং রোডে ছিল সর্বাধুনিক ব্যবস্থা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য। এমনকি প্রধানমন্ত্রী যদি গুরুতর আহত হন তার জন্য সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম-সহ বুলেটপ্রুফ একটি অ্যাম্বুল্যান্সে সর্বদা মজুত এক সুদক্ষ ডাক্তার। এই অ্যাম্বুল্যান্সেই আছে প্রধানমন্ত্রীর রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মেলানো আট বোতল বা ২ লিটার রক্ত। ইন্দিরার দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর, কিছুই কাজে লাগল না।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তায় ১৯৮২-তেই সারা দেশের বাছা বাছা ২৫ জন পুলিস অফিসার নিয়ে গড়ে তোলা হয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। কিছুদিনের মধ্যেই এই এস টি এফের নবনামকরণ হয় স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ। এস পি জি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের প্রায় ছায়াসঙ্গী ছিল। তখন থেকেই SPG-র শ্রী রবি মহিন্দর, জি এস সামুয়েল, অসিত শীল রাজীবের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন দেশে বিদেশে। পরে সংসদে আইন করে রাজীব এই বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীকে অপরিহার্য করে তোলেন। এস পি জি-র নিরাপত্তারক্ষীদের 'ব্ল্যাক ক্যাট' বলা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব অবশ্য আর এস পি জি-র নিরাপত্তা পেতেন না। তাঁর পরিবার এবং তাঁকে জেডশ্রেণীর নিরাপত্তা দেওয়া হতো। ইতিমধ্যেই দুবার রাজীবের প্রাণহানির চেষ্টা হয়, একবার ১৯৮৫-র ১১ অক্টোবর ব্রিটেন সফরকালে। সেই প্রাণঘাতী চেষ্টা বানচাল করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, ১৯৮৭-তে শ্রীলঙ্কা সফরের সময় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করে এক সিংহলি সেনা। ব্ল্যাক ক্যাটরাই সেযাত্রা রক্ষা করেন রাজীবকে।

দিল্লির রাজঘাটেও রাজীবের ওপর একবার আক্রমণ হয়। বন্দুক দেশী ও বন্দুকবাজের নিশানা ঠিক ছিল না বলেই আবার রক্ষা পান তিনি। আততায়ী তিনদিন আগে থেকে ঝোপ-জঙ্গলে বসে ছিল অথচ নিরাপত্তারক্ষীরা খেয়াল করলেন না। আশ্চর্য!

রাজীব যখন বিরোধী নেতা বা কংগ্রেস সভাপতি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের 'রেড এবং ব্লু বুক' সার্কুলার অনুযায়ী 'ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি গার্ড' তাঁর নিরাপত্তার তদারকি করত। দিল্লি পুলিসের নিরাপত্তা ইউনিটের সাব-ইন্সপেক্টর প্রদীপকুমার গুপ্ত ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার। শ্রী গুপ্তও বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। সঙ্গে নিহত হয়েছেন এস পি মহম্মদ ইকবাল, ইন্সপেক্টর রাজাতরু ইন্সপেক্টর এডওয়ার্ড জোসেফ এবং অন্যান্য অফিসার ও পুলিসকর্মীরা। গুরুতর

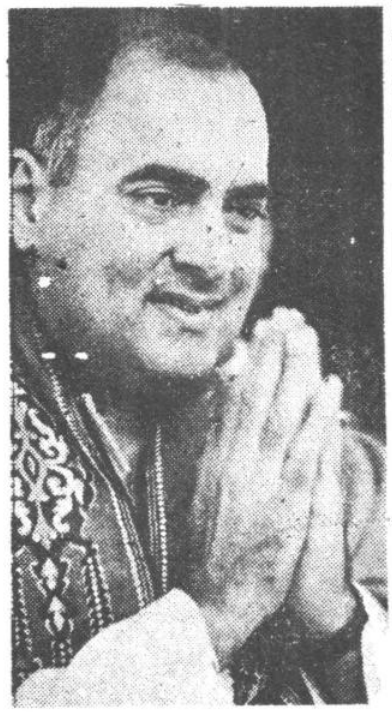

আহত হয়েছেন এস পি (নিরাপত্তা) শ্রী নালচিলকুমারণ এবং ডি আই জি মাথুর।

প্রধানমন্ত্রী অবস্থায় নিরাপত্তা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি হলেও ব্যক্তিগতভাবে রাজীব এসব পছন্দ করতেন না। এমনও দেখা গেছে, তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত রক্ষীদের জিপের চাবি পকেটে পুরে অন্য গাড়িতে তিনি উধাও হয়ে গেছেন। এ স্বভাব ছিল ইন্দিরা গান্ধীরও। এশিয়াডের কাজকর্ম দেখভাল করার জন্য চুপিসাড়ে নিরাপত্তা অফিসারদের না জানিয়েই তিনি চলে যেতেন দিল্লির বিভিন্ন স্টেডিয়ামে। এবারের নির্বাচনী প্রচারে বিশেষত রাজীব যেন উদ্দাম হয়ে গিয়েছিলেন। নিরাপত্তার বাধা অগ্রাহ্য করে যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়েছেন। সভা করেছেন। জনতার কাছাকাছি আসতে চাইছিলেন, তারা তাঁকে স্পর্শ করছিল। হয়তো তিনি স্পর্শ করছিলেন তাদের হৃদয়।

অথচ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গের এক বিধায়ক একটা দইয়ের হাঁড়ি উপহার দিলে সেটি প্লেনে তোলার আগে SPG ভিতরে বোমা আছে কিনা দেখতে প্রায় খোল বানিয়ে ছেড়েছিল। রাজ্যপাল যাবেন রাজীবের সঙ্গে, তাঁর সুটকেস পৌঁছে গেছে বিমানবন্দরে কিন্তু চাবি নেই— SPG ঐ সুটকেস প্লেনে তুলতে রাজি হয়নি। অথচ প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, আততায়ী একটি মেয়ে তার নিতম্বের ঠিক ওপরে কোমরে বাঁধা ছিল মারাত্মক প্লাস্টিক বিস্ফোরক RDX সাইক্লোট্রাইমেথিলিন-ট্রাইমাইট্রামিন। সাধারণত সামরিক বাহিনী এই ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করে বাড়ি বা সেতু উড়িয়ে দেবার জন্য। বিস্ফোরকটি মার্কিন সেনাবাহিনীর বলেই বিশ্বাস। কেননা ভারতীয় সেনাবাহিনী ধূসর রঙের RDX ব্যবহার করে।

তামিলনাড়ু ফরেনসিক দপ্তরের অধিকর্তা চন্দ্রশেখরন বলেছেন– RDX নমনীয় বিস্ফোরক হওয়ায় যেকোনো আকার দেওয়া যায়। কয়েকশো ইস্পাতের টুকরোর সঙ্গে তা মেশানো হয়েছিল। সম্ভবত ডেলক্রোতে ঢাকা একটি বেল্টে তা রাখা ছিল। বিস্ফোরণের পর এই টুকরো ইস্পাত বা পেলেটগুলি তীব্রগতিতে আঘাত করে। শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী রঞ্জন বিজেরত্নের হত্যার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। মিনাবক্কম বিমানবন্দরের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের মতে, অন্তত ১ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ব্যবহার না করলে বিস্ফোরণের তীব্রতা এত মারাত্মক হয় না। আত্মঘাতী মেয়েটি যে বেল্ট পরে ছিল তারই পিছনদিকে জিলাটিন স্টিক আটকানো ছিল। মেয়েটি প্রণামের ভঙ্গিতে রাজীবের সামনে নিচু হতেই যন্ত্রটি চালু হয়। বিস্ফোরক হিসেবে জিলাটিন, যার পোশাকি নাম নাইট্রোসেলুলোজ গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়।

ঐদিন শ্রীপেরুমবুদুরে রাজীবের নিরাপত্তায় কি ত্রুটি ছিল? সত্যপ্রকাশ মালব্য বলছেন, না। অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বলছেন, হ্যাঁ।

২১ মে-র সভায় রাজীব প্রায় দেড় ঘন্টা দেরিতে পৌছান শ্রীপেরুমবুদুরে। তামিলনাড়ুতে স্বাধীন তামিল বা 'ইলম' মোকাবিলায় ৫২ শাখার অফিসাররা ওদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও তাঁরা আগেই অগ্রতুল আলো, সুরক্ষার অভাব ইত্যাদির অভিযোগ তুলেছিলেন সভাস্থল সম্বন্ধে। স্থানীয় কংগ্রেসের আপত্তিতে সে অভিযোগ ধোপে টেকেনি। বিভিন্ন মহল থেকে যে পথগুলি এখন বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠছে সেগুলি এইরকম–

(১) যে তরুণী কোমরে বিস্ফোরক নিয়ে ঢুকছে তাকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে ধরা গেল না কেন?

(২) যে নিরাপত্তাবেষ্টনী নিশ্ছিদ্র থাকা উচিত সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত মহিলা ঢুকল কী করে?

(৩) কোনো ভি ভি আই পিকে মালা বা পুষ্পস্তবক যে কেউ দিতে পারে না। যাঁরা দিতে চান তাঁদের পুলিস সার্চ করে। পুষ্পস্তবক, মালা ইত্যাদিও সার্চ করে তবে তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কি এ বিধি মানা হয়েছে?

(৪) রাজীবের সফরসঙ্গী গাড়িটি বিস্ফোরণের পর দ্রুত পালিয়ে যায়। রাজীব যেখানে বিপদগ্রস্ত, কার নিরাপত্তায় গাড়িটি ৪৫ কিমি দূরে মাদ্রাজে গিয়ে থামে? রাজীব মৃত না হয়ে গুরুতর আহত হলে হাতের কাছে গাড়ি পাওয়া যেত না তাঁর চিকিৎসার জন্যে।

তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমবুদুরের কংগ্রেস সভাপতি সুলেমানের ভাষ্য অনুযায়ী ঘাতক মহিলা আর এক সুবেশা মহিলাকে নিয়ে নীলরঙের অ্যামবাসাডারে দুপুরে সভাস্থল ঘুরে যায়। তখন কি তাদের পরিচিতি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

(৬) তামিলনাড়ুর মহিলা কংগ্রেস সভাপতি লক্ষ্মী অ্যালবার্ট অভিযোগ তুলেছেন, সেদিন সভায় মেটার ডিটেক্টরের উপস্থিতি ছিল না। ব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফুলের মালা এবং অঙ্গবস্ত্রের অর্ঘ্যও পুলিস খালি চোখে দেখেই ছেড়ে দেয়।

(৭) দুর্ঘটনার ঠিক আগেই LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)-র বোমা বিশেষজ্ঞ নিউটনকে নাকি মাদ্রাজে দেখা গেছে।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিশেষ তদন্ত বাহিনী (Special Investigation Team) তৈরি হয়েছে ডি আর কার্তিকেয়নের নেতৃত্বে। গোয়েন্দাব্যুরো 'র', সি বি আই, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর ২৫ জন দুঁদে অফিসারকে নিয়ে তদন্তবাহিনী গঠিত হয়েছে। ঘটনাস্থল ঘুরে গেছেন CBI অধিকর্তা বিজয় করণ। ঘটনাস্থল থেকে তদন্তকারী দল জামাকাপড়, রক্ত, কাদা, তারের টুকরো, একটা স্প্রিং, 'মেড ইন ব্রিটেন' ছাপের একটি ব্যাটারি উদ্ধার করেছে। সেদিনকার সভার একটি ভিডিও ক্যাসেটও তাঁদের হাতে এসেছে। এছাড়াও কিছু স্টিল ফোটোগ্রাফ তারা পেয়েছে। অবশ্য নিরাপত্তার ত্রুটি নিয়ে আমরা যতই গলা ফাটাই না কেন, কোনো 'সুইসাইড স্কোয়াড' যদি কাউকে মারব বলে ঠিক করে তবে তার নিরাপত্তার বিধান ভীষণ কঠিন কাজ। আত্মঘাতী মহিলা, পুলিসের সন্দেহ সম্ভবত 'ব্ল্যাক টাইগার' নামক জঙ্গি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। LTTE ছাড়া আর কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর এই ধরনের সুইসাইড স্কোয়াড নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী নিরাপত্তা সম্বন্ধে দু-একটি উদাহরণ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাজীবের অন্ত্যেষ্টিতে যোগদানের জন্য আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন কুয়েল ভারতে এসেছিলেন সস্ত্রীক। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বিমানে এসেছিল তিনটি বিশেষ বুলেটপ্রুফ গাড়ি। একটি সস্ত্রীক তাঁর জন্য– অপরদুটি ওদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য।

জন কেনেডি যখন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান তখন তাঁর শরীর আড়াল করে শত্রুর সামনে শরীর পেতে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী। সাবাস্–সত্যি, জবাব নেই। ঐ নিবেদিতপ্রাণ রক্ষী কেনেডিকে বাঁচাতে পারেননি, কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে আজও দেশে-বিদেশে 'আইডল' হয়ে আছেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 'হাইরিস্ক সিকিউরিটি' বলতে দুজন –মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে জ্যোতি বসুর দুই সভাস্থল থেকে অস্ত্রহাতে দুজন ধরা পড়ায় তাঁর নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়েছে। দুটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি তিনি ব্যবহার করছেন–একটি কলকাতা এবং একটি জেলার জন্য। অন্যদিকে সিদ্ধার্থের প্রাণনাশের এক চেষ্টা লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের এই দুই VVIP-র জন্যই এখন কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা নিয়ত ব্যস্ত।

শুধুই ভি ভি আই পি নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোনো বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে নেই। কলকাতা পুলিসের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অবশ্য আছে। কিন্তু রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছেন SPG ধাঁচের একটি বাহিনী পশ্চিমবঙ্গের জন্যও গড়ে তোলার। এই বাহিনীর হাতে থাকবে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতারযন্ত্র, হাল্কা রিভলবার–যা দিয়ে ৫০ মিটার অবধি লক্ষ্যভেদ করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত ওয়েবলিস্কট, স্মিথ ওয়েসন বেশ ভারী রিভলবার।

প্রধানমন্ত্রির যাবার পর রাজীবের নিরাপত্তা থেকে SPG প্রত্যাহার করা হয়। রাজ্য গোয়েন্দা পুলিসের মতে, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় কেউ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী থাকুক বা না থাকুন, তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেন। ফলে রাজ্যে বিশেষ বোম স্কোয়াড তৈরির কথাও ভাবছে রাজ্য প্রশাসন।

বর্তমানে ভারতে নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনীগুলির অবস্থা সেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান চাঁদসদাগরের মতো। আপাত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও দেবীকোপে প্রিয়জন নিহত হচ্ছে। এই বাহিনীগুলি চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু জটিল রাজনৈতিক তথা ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির বাতাবরণে আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক চলছে। মাইন ডিটেক্টর বা জিপ্সির ডগ দিয়ে কতক্ষণ লড়াই চালানো যাবে রাজীবের অন্ত্যেষ্টিতে ঐতিহাসিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেছে। শেষযাত্রায় বহুতল বাড়ির ওপরতলাতেও আগ্নেয়াস্ত্র ও দূরবীন হাতে ছিল নিরাপত্তাবাহিনী সমস্ত পথ জুড়ে। FNSG, SPG অতন্দ্র প্রহরা দিয়েছে অন্ত্যেষ্টিস্থলে।

নিহত হবার ক'দিন আগেই রাজীবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– 'নির্বাচনী প্রচারে কি আপনার প্রাণহানি ঘটতে পারে?' স্মার্ট জবাব–'কী করব, প্রচার তো চালাতেই হবে।'

ঠিকই তো জনগণের নেতা জনতার সঙ্গেতো মিশবেনই। বক্তৃতামঞ্চ থেকে ৬০ ফুট দূরে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে শ্রোতারা থাকবেন, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সবাই পরীক্ষা করা হবে–এসব নিরাপত্তারক্ষীদের মাথাব্যথা। তবে প্রশ্নটা সেখানে নয়। ১৯৯১-এর ২১ মে ঘাতক ব্যক্তিগতভাবে রাজীব, সার্বিকভাবে ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হেনেছে। যে দেশে নাথুরাম গডসেকে বীরপূজা করতে পারেন কোনো নেতা, সেখানে এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। বিপদগ্রস্ত কোনো VVIP ব্যক্তি নন, বিপদগ্রস্ত আসলে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য, অসাম্প্রদায়িকতার ট্র্যাডিশন। মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ ছাড়া কোনো VVIP নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়।

আমার পছন্দই ছিল রাজীবের পছন্দ : সোনিয়া গান্ধী

সোনিয়া গান্ধী এই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন রাজীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। এছাড়াও আছে তাঁর নিজের কথা। সঙ্কলন **অরূপ করের।**

প্র : ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি হলেন আপনার স্বামী রাজীব গান্ধী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হবার সুবাদে আপনিও প্রচারমুখী হবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা গেছে আপনি প্রচারবিমুখ, সাধারণত সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার আপনি দেন না। এড়িয়ে চলেন। এটা কেন? এটা কি আপনার কোনো নীতি?

উ : না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা নীতির কোনো ব্যাপার নেই। আমি প্রচারবিমুখ হবার কোনো চেষ্টাও কোনোদিন করিনি। আমি প্রচারের আলোয় আসতে চাইনি কোনোদিন—এটা আমার অন্তর্নিহিত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন।

প্র : আপনার শৈশব, স্কুলজীবন কিভাবে কেটেছে?

উ : পড়াশোনায় আমার উৎসাহ, আন্তরিকতা ছিল যথেষ্ট। আমি পড়তাম কনভেন্টে। সময় কাটত দুরন্তপনা করে, হৈচৈ করে, খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ করে। সাধারণত কনভেন্টে বিতর্ক, নাটক, কুইজ হত না। তবে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে নান্‌রা আমাদের বলতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে, অংশ নিতে। তবে তখনো অন্যদের থেকে নিজের স্বাতন্ত্র প্রমাণের কোনো প্রয়াস আমার ছিল না।

প্র : রাজীবজীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অনেক সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয়, দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। ক্লান্ত হয়ে তিনি যখন বাড়ি ফেরেন, তখন ঘরোয়া পরিবেশে তিনি কেমন অনুভব করেন? কোন্ জিনিসটি তাঁকে আরাম দেয়, শান্তি হয়, তিনি তৃপ্তবোধ করেন? তাতে আপনার কি ভূমিকা থাকে?

উ : রাজীবজী সারাদিন এত ব্যস্ত থাকেন যে কাজ থেকে তাঁর ছুটি মেলে না। বাড়িতে ফিরেও তাঁকে কোনো-না-কোনো কাজ করতে হয়। তবে সঙ্গীত ওঁকে মানসিক তৃপ্তি দেয়। ওঁর ক্লান্তি দূর করে।

প্রশ্ন : কি ধরনের সঙ্গীত রাজীবজীর পছন্দ?

উ : ভারতীয়, পাশ্চাত্য—দু'ধরনের সঙ্গীতই ওঁর পছন্দ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বাখ, মোজার্টই সবচেয়ে প্রিয়। আমার শাশুড়ি ইন্দিরাজীও বাখ, মোজার্ট পছন্দ করতেন। জাজও রাজীবকে আনন্দ দেয়, তবে কাজের চাপ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি, হালকা সঙ্গীত, বাজনা শুনতেই ও বেশি ভালোবাসে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে শুভলক্ষ্মী, ভীমসেন যোশি, ডাগরভাইয়ের খেয়াল বা সরোদ ওঁর সেরা পছন্দ। আমারও মনে হয়, ভারতীয় সঙ্গীতের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে—যা ক্লান্তমনকে সজীব করে, অনুপ্রেরণা দেয়।

প্র : রাজীবজীর পাইলট থাকাকালীন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের মধ্যে আপনার জীবনধারায় কোনো পরিবর্তন এসেছে?

উ : আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কোনো চিড় ধরেনি। তবে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রির ওঁর জীবন থেকে সময় অনেকটা কেড়ে নিয়েছে। আজ পারিবারিক সান্নিধ্য, স্পর্শটুকুও সময়ের অভাবে ও উপভোগই করতে পারে না। তবে হাজারো কাজের মধ্যে পাঁচ মিনিট সময় হাতে পেলেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেন। ছেলে রাহুল বা মেয়ে প্রিয়াংকার খোঁজখবর নেন। রাহুলের প্রিয় কোনো ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বিন্দুমাত্র সময় না পেলেও সবসময় চেষ্টা করেন ঘরোয়া স্পর্শটুকু আমাদের উপহার দিতে।

প্র : আপনাদের প্রথম দেখা কোথায়, কবে?

উ : (সলজ্জ হাসি হেসে) কেমব্রিজে আমাদের প্রথম দেখা। রাজীব তখন কেমব্রিজের ছাত্র। আমি ভাষাশিক্ষার স্কুলের ছাত্রী। আমি দো-ভাষীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসিভাষা শিখতাম। আমার অনেক বন্ধুর মধ্যে একজন ছিল জার্মান। সে আমার মাতৃভাষাও ভালো জানত। রাজীব ছিল ওর প্রিয়বন্ধু। ওরই মাধ্যমে রাজীবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কখনো আমাদের দলটি যেত কোনো রেস্তোরাঁয়। কখনো সিনেমায়, কখনো কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠানে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা একত্রে আনন্দ করতাম। রাজীব আর আমি দু'জনেই ছিলাম কেমব্রিজে বিদেশী। হয়তো এজন্যই আমাদের বন্ধুত্ব তখন ধীরে-ধীরে প্রণয় হয়ে উঠেছিল। আর মেয়েদের একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যার সাহায্যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম অন্যদের থেকে রাজীব স্বতন্ত্র, পৃথক। ওঁর চরিত্রের মধ্যে গভীরতা ছিল। অন্যদের থেকে ও ছিল আলাদা।

প্র : তারপর?

উ : আমি রাজীবের প্রেমে পড়ে গেলাম। (হাসিতে ফেটে পড়লেন)

প্র : ইন্দিরাজীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় কিভাবে?

উ : হ্যাঁ, প্রথমে রাজীব তাঁর মাকে এক চিঠিতে আমার কথা বলে। আমাকে জানায় ওঁর মা'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাতে চায়। আমার তখন ধারণা ছিল, আমার ভাবী শাশুড়ি ইন্দিরাজী এদেশের তথ্যমন্ত্রী। যাই হোক, লন্ডনে সে-সময় নেহরুজীর ওপর একজিবিশন হবার কথা ছিল। ইন্দিরাজী সম্ভবত ওই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করতে লন্ডনে এসেছিলেন। তিনি রাজীবকে লেখা তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন, সোনিয়াকে ওই অনুষ্ঠানে নিয়ে এসো। আমি ওকে দেখতে চাই। প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি আমায় বলেছিলেন, "দেখ সোনিয়া, আমি এক মা। আমাকে ভয় পেয়ো না। তিনি আমাকে বোঝান, একদিন আমার মতো তিনিও ভিন্ন ধর্মের একটি মানুষকে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন। তিনি আমায় বললেন, "আমি রাজীবের প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা জানি।"

প্র : ইন্দিরাজীর কাছে প্রথম উপহার কি পেয়েছিলেন?

উ : প্রথম সাক্ষাৎকারেই ইন্দিরাজীর গভীর ব্যক্তিত্ব আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। আমার আর রাজীবের সেদিন একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা ছিল। সাক্ষাৎকারের পর যাবার জন্য ইন্দিরাজীর অনুমতি চাইতেই তিনি আমায় একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর সুঁইসুতো দিয়ে আমার পোশাকের একটা ছেঁড়া জায়গা সেলাই করে দিলেন। এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে আমি হতচকিত, মুগ্ধ হয়ে

গেলাম। এই ঘটনাটিতেই একমুহূর্তে আমি ইন্দিরাজীর সম্পূর্ণ অনুরক্ত হয়ে গেলাম—এটাই আমার এক বড় পাওয়া।

প্র : এই ঘটনার পর নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ ছিল না?

উ : না, ঠিক তা নয়। আমার বাবা-মা'র দিক থেকে বাধা আসবে আমি জানতাম। আমার বাবা অত্যন্ত কড়াধাতের মানুষ, অত্যন্ত গোঁড়া, রক্ষণশীল। তাঁর মেয়ে বহুদূরের একটি দেশে সম্পূর্ণ পৃথক এক সংস্কৃতি পরিবেশ, আবহাওয়ায় ঘর-সংসার করবে, এটা তিনি চাননি। অনেকভাবে বোঝানোর পর তাঁর সম্মতি পেয়েছিলাম। তিনি আমায় বলতেন, এখন তোমার বয়স মাত্র কুড়ি। একুশ বছর বয়স হলে আগে ভারতে যাও। দেখ দেশটা তোমার ভালো লাগে কি না, সেখানে তুমি মানিয়ে চলতে পারবে কি না। তারপর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নাও। তবে আমার মন কি করে রেখেছিল, তা আমি জানতাম। তবুও ভাবলাম বাবার কথাকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে দুঃখ দেওয়াটা উচিত হবে না। তাঁর কথাকে মেনে নিয়েই ভারতে এলাম একুশ বছর বয়সে।

প্র : ভারত সম্পর্কে তখন কোনো অনিশ্চয়তা ভয় আপনার মনকে ঘিরেছিল? ভয় কাটল কিভাবে?

উ : আমার মনে ভারত সম্বন্ধে কোনো ভয় অনিশ্চয়তা ছিল না। এর কারণ হল, রাজীব আমার পাশে ছিল। ও-ই ছিল আমার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।

প্র : প্রথম দর্শনে ভারতবর্ষকে কেমন লেখেছিল?

উ : প্রথম দর্শনেই এ-দেশকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কারণ, ভারত যেহেতু রাজীবের দেশ, তাই আমিও এ-দেশকে আমার দেশ বলে ভেবেছি। কিন্তু প্রায়ই যখন দিল্লির পথেঘাটে সন্ধ্যায় ঘুরতে বেরোতাম, চারিদিকে দারিদ্র্য ভয়াবহতা দেখে দুঃখবোধ করতাম। আমার দেশ ইতালিতেও আমি দারিদ্র্য দেখেছি, কিন্তু এদেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তবে সতেরো বছর আগে এদেশে যে দারিদ্র্য ছিল, বর্তমানে তা নেই। পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

প্র : প্রথম-প্রথম বাবা-মাকে ফেলে ভারতে এসে আপনার বাড়ির জন্য মন টানত?

উ : হ্যাঁ, প্রথমে বাবা-মা'র জন্য মন কেমন করত। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সংকল্প করলাম দ্বিধার মধ্যে থাকলে চলবে না। এদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্কের শিকড় যতদিন না দৃঢ় হচ্ছে, ততদিন ইতালির প্রতি, বাবা-মা'র প্রতি কোনো নরম অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেব না। তাই এখানে এসেও বাবা-মা'র পরিচিত স্বদেশীয়দের সঙ্গে আমি ইচ্ছে করেই যোগাযোগ রাখিনি। যখন নিশ্চিত হলাম ভারতবর্ষে আমার সম্পর্কের শিকড় গভীরে

আমেথি থেকে মনোনয়নপত্র পেশের পর। মিষ্টিমুখ

প্রোথিত হয়েছে, তখনই সকলের সঙ্গে খোলামনে মেলামেশা শুরু করলাম। প্রথমবার আমার মা এদেশে আমাকে দেখতে আসার সময়ের একটা ঘটনা বলি। মাকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে আমি গিয়েছিলাম। বিমানে উঠতেই বিষণ্ণতায় বুক ভরে উঠল। ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম। ইন্দিরাজী তখন অফিসে কর্মব্যস্তা। আমি একাকী অনুভব করছিলাম। হঠাৎ ইন্দিরাজীর অফিস থেকে একটা চিঠি এল। তাতে ইন্দিরাজী লিখেছেন, সোনিয়া আমরা সকলেই তোমায় ভালোবাসি। আমরা তোমার সঙ্গে সবসময় আছি। ওই কয়েকটি কথাই আমাকে প্রচণ্ড আনন্দ দিল। আশ্বস্ত করল। ওই নোটটা আমি যত্নে রেখে দিয়েছি।

প্র : রাজীবজী যখন কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আপনার সময় কাটত কিভাবে?

উ : রাজীব যখন বিমানচালক ছিলেন, তখন দু-তিনদিন খুব কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আবার হয়তো দু-তিনদিন ছুটি থাকত। তখন উষা, ভগত বা কৃষ্ণা—এরা যে কেউ আমায় সঙ্গ দিত। আমি ঘর গোছানোর ব্যাপারটা শিখতাম ওদের কাছেই। ভারতীয় রান্নাবান্না শিখতাম। ইন্দিরাজী আমার ওপর অতিথি পরিচর্যার দায়িত্ব দিতেন। ওঁর জন্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটার কাজও আমি করতাম। এভাবেই সময় কেটে যেত।

প্র : রাজীবজী আপনার কাছে কি চাইতেন?

উ : (সলজ্জ হাসি হেসে) আমার পছন্দই তাঁর পছন্দ।

প্র : আপনাকে রাজীবজী প্রথম কি উপহার দিয়েছিলেন?

উ : একবার বিদেশ থেকে ফেরার সময় রাজীব আমার জন্য জরিবুটি-দেওয়া একটি গাঢ় নীলরঙের বেনারসী শাড়ি এনেছিলেন। গাঢ় নীলরঙ আমার খুব পছন্দ—এটা তিনি জানতেন।

প্র : রাজীবজী ছুটিতে থাকলে আপনার দিনগুলি কিভাবে কাটত?

উ : আমারা কেমব্রিজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতাম। সঞ্জয়ের বন্ধুরা, অমিতজী

(অমিতাভ বচ্চন)—সকলে আড্ডা দিতাম। গান শুনতাম। কখনো নাচের আসরে যেতাম, সিনেমা, পিকনিকে যেতাম।

প্র : দুই সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজীবজী এত আকর্ষণীয় যে অনেকেই ওঁকে দেখে বলেন, হি; হ্যান্ডসাম। অল্পবয়সে নিশ্চয়ই রাজীবজীকে আরো চমৎকার, আকর্ষণীয় লাগত?

উ : (গর্বের হাসি হেসে) রাজীব সত্যিই আকর্ষণীয়। যে-কেউ ওঁকে দেখেই মুগ্ধ হবেন। আমারও তাই হয়েছিল। তবে ওঁর আকর্ষণীয় চেহারাই শুধুমাত্র আমায় আকৃষ্ট করেনি। আমি ওঁর মনের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছিলাম। এতবড় পরিবার, ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজীবের মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। চাতুরি, কূটবুদ্ধি, হীনতা ছিল না ওঁর মধ্যে। প্রদীপ কাউল, অরুণ সিং, সুমন দুবে—সকলেই আসত। কোনো-কোনো দিন বহু দূরে ঘুরতে যেতাম।

প্র : আপনার ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? কি আশা আপনার ওদের ঘিরে?

উ : রাহুল এখনো বেশ ছোট। বড় হয়ে ও কি হতে চায়, তা আমি এখনো ঠিক জানি না। তবে রাহুল-প্রিয়াংকা যাই-ই চায়, আমরা ওদের সাহায্য করি। রাহুলকে বাইরে থেকে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় মনে হলেও ভিতরে ও খুব কোমল, অনুভূতিপ্রবণ। বাবার মতো ও ফুটবল, যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে ভালোবাসে।

বন্দুক ছুঁড়তেও খুব ভালোবাসে ও। পড়াশুনাতেও ওরা দু'জনেই খুব আগ্রহী। বাড়িতে 'নিউজ উইক বা টাইম' এলে ওরা গোগ্রাসে পড়ে।

প্র : ভারতীয় ইতিহাস শিল্পকলা সম্বন্ধে ওদের আগ্রহ আছে?

উ : হ্যাঁ, ওদের আগ্রহ যথেষ্ট। প্রিয়াংকা ভারতনাট্যম শিখছে ও ছবিও আঁকতে পারে। ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্যের প্রতিও আকর্ষণ আছে। রাজনীতি সম্পর্কে ওরা বিশ্বে কোথায় কি ঘটছে তাঁর খোঁজখবর রাখে। ওরা ওদের ঠাকুমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, বিশেষত রাহুল।

প্র : ইন্দিরাজীর কাছে বিশেষ কিছু আপনি শিক্ষণীয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন?

উ : হ্যাঁ, তাঁর উপদেশমতো আমি সপ্তাহে একদিন উপোস করি।

প্র : আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন? কোন্ বই আপনার প্রিয়?

উ : হ্যাঁ, প্রথমে আমি ফিক্‌সন জাতীয় বই পড়তে বেশি ভালোবাসতাম। এখন আমি জীবনীমূলক-আত্মজীবনীমূলক রচনায় বেশি আগ্রহী। আমার সবচেয়ে প্রিয় বইটি আমাকে ইন্দিরাজী দিয়েছিলেন। বইটি হেলেন কেলারের আত্মজীবনী। শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যার ওপর লেখা বইও আমি পড়তে খুব পছন্দ করি। প্রাচীন ভারতের মিনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

প্র : আপনি এত ভালো হিন্দি বলা শিখলেন কিভাবে?

উ : প্রথমে আমি নিজে নিজে শেখার চেষ্টা করতাম। তারপর হিন্দি শেখার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পরে একটি হিন্দি ইনস্টিটিউটে তিনমাসের কোর্সে ভর্তি হলাম। এছাড়া বাড়িতে ডিনার টেবিলে বসে হিন্দিতে কথাবার্তা চালানো আমাদের পরিবারের রীতি। ধীরে-ধীরে এভাবেই ভাষাটা রপ্ত করে নিলাম। ■

রাহুল-প্রিয়াংকা : স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ

প্রিয়াঙ্কা এবং রাহুলকে নিয়ে এক অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন বরুণ মুখার্জির।

দিল্লির এই পরিবারের স্বাধীনতার আগে থাকতেই কতকগুলি নিয়ম আছে। যেমন, পরিবারের সকল সদস্যকে একসঙ্গে খেতে বসতে হবে, খাওয়ার পাত্রে সাধ্যাতিরিক্ত খাদ্য নেওয়া চলবে না অর্থাৎ কোনো খাদ্যবস্তু যেন নষ্ট না হয়। ১৯৮০-৮১-র ঘটনা—যে-পরিবারের কথা বলছি, তার সদস্য মোট পাঁচজন। বয়স্কা মা, ছেলে, ছেলের বউ, ছেলের দুই ছেলে-মেয়ে। ছেলের ১০, মেয়ের বয়স মাত্র ৮। মায়ের সঙ্গে নাতি-নাতনীর ভীষণ ভাব। নাতি-নাতনীর ভীষণ খুঁতখুঁতুনি খাবার সম্বন্ধে এটা খাব না, ওটা খাব না ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে আবার ভয় বাবাকে। খুব ভাল করেই ওরা জানে বাবা অপচয় একেবারেই পছন্দ করেন না। অগত্যা দিদাই ভরসা। দিদার কানের কাছে মুখ এনে কিংবা দিদার দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিতে বলে দিলেই হল—দিদা, আর ত' খেতে পাচ্ছি না। ঠাকুমা ছেলেকে লুকিয়ে নাতি-নাতনীর প্লে ট থেকে অবশিষ্ট খাদ্য নিজের প্লেটে এনে খেয়ে নেবেন। অবশ্যই ছেলে যেন জানতে পারে। দিদাকে তখন নাতি-নাতনী মনে-মনে অজস্র ধন্যবাদ জানায়।

আবার দিদা একটু সময় পেলেই নাতি-নাতনীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মগ্ন হয়ে ওঠেন। দিদাই

রাহুলের হাতে অস্ত্রিকলস। পেছনে প্রিয়াংকা।

বারেবারে চোর হন আর খোঁজেন তার নাতি-নাতনীদের। ওদের সঙ্গে দমে পাল্লা দিতে না পেরে বসেও পড়েন একসময়।

কৌতূহল নিবারণার্থে জানাই গল্পের দিদা ইন্দিরা গান্ধী, নাতি-নাতনী রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। ছেলে ও ছেলের বউ যথাক্রমে রাজীব ও সোনিয়া।

রাহুলের জন্ম ১৯শে জুন ১৯৭০। মোটামুটি মাস আঠারো পর জন্ম প্রিয়াঙ্কার ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২। রাজীব-সোনিয়ার প্রথম সন্তানটি জন্মসময়েই মারা যায়। জন্মের পর থেকেই একটি রাজনৈতিক বাতাবরণে বড় হতে থাকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। দেশে জরুরী অবস্থা, ঠাকুমার ক্ষমতা হারানো এবং আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়া। একটিমাত্র কাকার দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইত্যাদি ভারতীয় রাজনীতির ক্রান্তিকালগুলির সাক্ষী এই দুই দাদা-বোন। ব্যক্তিসন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক হত্যার যে ভয়ঙ্কর দুটি ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে আলোড়িত করেছে তাতেও সাক্ষী রাহুল-প্রিয়াঙ্কা।

রাজীব-সোনিয়া প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের ওপর কিছুই চাপিয়ে দেননি। ওদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করেছেন। ওরা তাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

একেবারে বাবার মতই রাহুল ভীষণ আগ্রহী কারিগরী প্রযুক্তি কৌশল সম্বন্ধে। দেশেবিদেশে কী ঘটছে এ সম্বন্ধেও ভীষণ আগ্রহ। বাড়িতে যখন বিদেশী ম্যাগাজিন 'নিউজউইক' বা 'টাইম' আসতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলত ওরা। দুই ভাইবোনের মধ্যে এ নিয়ে খুনসুটিও হতো যে কে আগে পড়বে। সমস্যা সমাধানে বেশিরভাগ সময়েই এগিয়ে আসতেন সোনিয়া স্বয়ং। টস করে তিনি এই সমস্যার সমাধান করতেন। নেহরু-গান্ধী পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের ভারতীয় কথা, ইতিহাস, মিথোলজি সম্বন্ধেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা ভারতনাট্যম শিখেছে। ভারতনাট্যম শেখার সূত্রেই অনেক পুরাণ-কাহিনী-প্রাচীন কাব্য প্রিয়াঙ্কা মুখস্থ বলতে পারে।

অনেকেই হয়ত জানেন না শিল্পসংগ্রহে সোনিয়া একজন বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে দিল্লির নেহরু মিউজিয়মে নিজেই অঙ্কনশিক্ষার একটি ক্লাস পরিচালনা করেন। এই বিশেষ দিকটি প্রথম থেকেই মেয়েতে সঞ্চারিত। দারুণ আঁকতে পারে প্রিয়াঙ্কা, নিজস্ব অয়েল প্রিন্টিংও আছে। ইতিহাস, রাজনীতি এবং সাহিত্য প্রিয়াঙ্কার বিশেষ আগ্রহবস্তু। শুধুমাত্র বইয়ের পোকা না হয়ে ওরা আশেপাশে তাকায়, বিশ্বে কোথায় কি ঘটছে খোঁজখবর রাখে। খবরের কাগজ এবং শুধুই খবরের কাগজ এত খুঁটিয়ে পড়ার নেশায় দুই ভাইবোনেই আক্রান্ত।

বর্তমানে রাহুল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পাঠরত। স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে রাজীব চেয়েছিলেন রাহুল কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা করুক। ওদিকে সোনিয়ার ইচ্ছা ইতিহাস।

ফলত দুটি ইচ্ছার একটি মীমাংসা হয়। ঠিক হল এখন হার্ভার্ড স্নাতকোত্তর ইতিহাস পড়ুক। এই পাঠক্রম শেষ হলে আবার কম্পিউটার নিয়ে পড়বে। রাহুল ওর সাম্মানিক স্নাতক কোর্স শেষ করে দিল্লির অভিজাত সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে। এই কলেজে রাহুলের ভর্তি নিয়েও যথেষ্ট জলঘোলা হয়। ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে যে নম্বর ১০+২ পাঠক্রমে দরকার হয় ভর্তি হবার জন্য রাহুলের তা কিন্তু ছিল না। রাজীব তখন প্রধানমন্ত্রী। মোটামুটি পিছনের দরজা দিয়ে রাহুলকে ঢোকান হয় স্পোর্টস-এর কোটায়। এনিয়ে স্বদেশী-বিদেশী কাগজপত্রে বিতর্ক-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ভারতীয় সংসদেও বিরোধীরা এ-প্রসঙ্গ তোলেন।

মধ্যে কিছুদিন ভাইবোনকে মস্কো পাঠানো হয়েছিল উচ্চশিক্ষার্থে। কিন্তু খুব বেশিদিন ওরা ওখানে থাকেনি। ফিরে এসেই রাহুল সেন্ট স্টিফেন্স এবং প্রিয়াঙ্কা জিসাস অ্যান্ড সেন্ট মেরিজে। প্রিয়াঙ্কার জন্য অবশ্য কোনো সুপারিশের প্রয়োজন হয়নি। আজও প্রিয়াঙ্কা সাইকোলজি পড়ছে ওখানেই।

ভাইবোন দুজনেই কিছুটা অন্তর্মুখী, মুখচোরা—অন্তত প্রথমদিকে। একটা ঘটনার কথা বলা যাক—কয়েকমাস আগের ঘটনা। সেন্ট মেরিজে বিতর্ক-সভা হচ্ছে, বিষয় 'ভোটদানের বয়স ১৮তে নামানো উচিত নয়।' প্রতিযোগী হিসাবে রয়েছে প্রিয়াঙ্কাও। খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই শুরু করল প্রিয়াঙ্কা। 'পৃথিবীর সব দেশেই যখন ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ১৮ তবে এখানেই বা তা হবে না কেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি একই বয়সে বেশি বিচারবুদ্ধি জন্মায়। সাবাস, শুরুটা ভাল হল। বিচারকরা মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। কিন্তু একি ? এরপর প্রিয়াঙ্কা নিশ্চুপ প্রায় ৪৫ সেকেন্ড ধরে। কোনও জোরালো যুক্তি আর নেই। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনভাবে—'গ্রামাঞ্চলে থাকা ১৮ বছর বয়স্ক ভারতীয় যুবক-যুবতীদের যে বিরাট অংশ রয়েছে তাদের স্বাধীন মতামত থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তারাও একই সিস্টেমে বা ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে— ১৮ বছরে কি তারা নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে পারে না?' তারপর অবশ্য তরতর করে অনেকক্ষণ বলে প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু মধ্যে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকায় প্রতিযোগিতায় সে কোনোওস্থান পেল না। কলেজের প্রতিযোগিতায় স্থান না পেলে কি হয়। এই প্রিয়াঙ্কাই ১৯৮৯-এর নির্বাচনে এবং এবারেও পিতা রাজীব গান্ধীর হয়ে যেন আমেথিতে মুখ্য আমন্ত্রিত বক্তা। ছোট ছোট সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন মা ও মেয়ে। সকলের অভাব অভিযোগ শুনে প্রিয়াঙ্কাই তা প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছে।

১৯৮৯-এর নভেম্বরে যখন ভোট হয় তখন ভোটের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়। প্রিয়াঙ্কা চেয়েছিল ভোটটা যেন জানুয়ারীতে হয়, কেননা তখন ওর ১৮ হয়ে যাবে। কিন্তু রাজীব নভেম্বরেই ভোট করেন। বাবাকে দ্বিতীয়বারের জন্য দিল্লির মসনদে বসানোর জন্য এবারও প্রিয়াঙ্কা প্রচুর পরিশ্রম করেছে। হায় রে !

বেনজিরের অভিমত কতটা যুক্তিসমৃদ্ধ আর কতটা আবেগতাড়িত জানা নেই। কিন্তু শক্তিস্থলে রাহুল কর্তৃক রাজীবের মুখাগ্নির ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বি বি সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় নেত্রী বলেন, ১৯ বছরের প্রিয়াঙ্কার মধ্যে তিনি অতীব ক্ষমতাসম্পন্ন এক ভাবী নেত্রীকে দেখতে পাচ্ছেন।' কঠিন চরিত্র, পিতামহীর মত দৃঢ় ইত্যাদি বিশেষণও ছিল প্রিয়াঙ্কা সম্বন্ধে।

রাজীবের নাম উগ্রপন্থীদের হিটলিস্টে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাহুল-প্রিয়াঙ্কার এক বন্দীজীবন শুরু হয়। ১৯৮৮ তে রাজীব এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের সমস্যা আমি বুঝি। সামনের বছর ওরা আবার কলেজে ভর্তি হবে। সুতরাং আমাকে ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা অন্যভাবে ভাবতে হবে। পুলিস যখন মাঝেমধ্যেই লালসঙ্কেত জারি করে তখন ত ওদের বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ। এটাই সমস্যার জন্ম দেয়।

সত্যি তো উঠতি বয়সের দুটি ছেলেমেয়েদের কাঁহাতক ভাল লাগে বাইরে না বেরিয়ে শুধুই বাড়িতে সাইকেল চালানো, সিকিউরিটি অফিসারদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলা কিংবা ভিডিও গেমস খেলায়। নিঃসঙ্গতা আর নিঃসঙ্গতা। বাবারও দেখা মেলে না সবসময়।

একাকীত্ব রাহুলকে এতবেশি প্রভাবান্বিত করেছিল যে রাজীব তাঁকে একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা পর্যন্ত করান। এই অবসাদ কাটাতেই রাজীবই তাকে একদিন দক্ষিণ দিল্লির মেহেরোলিতে পাঠান খামার বাড়িতে। সেখানে মাছ ধরতে গিয়েও বিপদে পড়েন রাহুল। এক দুর্ঘটনায় মাসখানেক বাড়িতে আবার শয্যাশায়ী। 'দ্য ইনার সার্কেল অ্যান্ড দ্য ইনারমোস্ট সার্কেল' এর নিরাপত্তায় হাঁপিয়ে উঠেছিল দুটি ছেলেমেয়ে। গ্রীক ট্রাজেডির 'নেমেসিস-এর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত।

সেন্ট স্টিফেন্সে পড়ার সময় রাহুলকে প্রায়ই দেখা যেত একটি নির্দিষ্ট খাবার দোকানের সামনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কোল্ডড্রিঙ্কস খেতে, আড্ডাও হতো চুটিয়ে। কিন্তু রাহুল জানতও না খাবার দোকানের মধ্যে বসা তিন/চারজন আসলে তার নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু এখন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বোস্টনের ভীড়ে যেমন কেউ তাকে চিনতে পারে না, দিল্লিতে কিন্তু চিনে ফেলত। ঐ দ্যাখ, রাজীবের ছেলে'--এ জিনিস নিশ্চয়ই ভীষণ অস্বস্তিকর।

রাইফেল শ্যুটিঙে রাহুলের হাতটি বেশ পাকা এবং একটি গেমস যাতে খুব কম মানুষই সফলকাম হন সেটি জলের তলায় টার্গেট প্র্যাকটিস। রাহুল কিন্তু এতেও এক নম্বর।

মা-বাবার মতো রাহুল-প্রিয়াঙ্কার ভীষণ আগ্রহ ক্ল্যাসিকাল মিউজিকে। এছাড়াও রাহুল রবিশঙ্করের সেতারেরও ভক্ত। কখনও কখনও বাবা-ছেলেতে জাজও শুনতেন।

প্রিয়াঙ্কা কিন্তু এত অন্তর্মুখী নয়। দিল্লিতে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও প্রিয়াঙ্কা জড়িত। 'হোলি'তে গান্ধী-নেহরু পরিবারে মনিব-ভৃত্য-কর্মচারী একাকার হয়ে যায়। প্রধান উদ্যোক্তা প্রিয়াঙ্কা। কর্মচারী-ভৃত্য পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রঙ দিয়ে ভরিয়ে দেবে এই উচ্ছল মেয়েটি। ভালোবাসা যে প্রতিদানমূলক প্রিয়াঙ্কা জানে। সবাই ওর পিতামহীর ছায়া ওর মধ্যে দেখছে কি সেই কারণেই?

দেশজ পোশাকেই বিশেষ আগ্রহ প্রিয়াঙ্কার। সালওয়ার কামিজ, বিশেষ অনুষ্ঠানে শাড়ীও পরে। ওদিকে রাহুল স্পোর্টস গেঞ্জি, স্পোর্টস ট্রাউজারের ভক্ত। বিশেষ অনুষ্ঠানে চোস্ত পাঞ্জাবিও প্রিয় পোশাক। প্রিয়াঙ্কার মায়ের কাছে শেখা দেশীয় গাজরের হালুয়া, ইতালিয়ান পেস্তস্তা। তবে ব্যক্তিত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৎপরতায় প্রিয়াঙ্কা রাহুলকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৮৪-র ইন্দিরা নিধনের সময় রাজীব ছিলেন। এখন রাজীবের সেই ভূমিকাই পালন করছে সদ্যযুবতী একটি মেয়ে। সোনিয়া এক্ষুণি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলে ঘরে-বাইরে যে বিতর্কের ঝড় উঠত একথা বুঝতে দেরি হয়নি বিচক্ষণ প্রিয়াঙ্কার। মূলত অমিতাভ ও প্রিয়াঙ্কাই হত্যা-পরবর্তী সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- তা সে শক্তিস্থলে অন্ত্যেষ্টি স্থান

মা'র দু'পাশে প্রিয়াংকা আর রাহুল। রাজীবের মরদেহ নিয়ে শেষযাত্রা শুরু হবার সময়। তিনমূর্তি ভবনের সামনে।

নির্বাচনই হোক বা বিদেশী অতিথি অ্যাপায়নই হোক। মা দাদাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, চোখের জল মোছাচ্ছেন, নিজের হৃদয়ে শুধুই অবিরাম রক্তক্ষরণ। প্রিয় ড্যাড নেই!

সঞ্জয়ের দুর্ঘটনায় অকালমৃত্যুতে স্টোয়িক ইন্দিরার আচরণে অনেক বিতর্ক উঠেছিল দেশজুড়ে। ইন্দিরার চোখ দিয়ে জল পড়ে না, নিষ্ঠুর ইত্যাদি অপবাদও শুনতে হয়েছে।

সেইসব দুষ্টজন ইন্দিরা, রাজীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ, কাঠিন্যকে কী বলবেন। কী বলবেন প্রিয়াঙ্কার এতবড় শোকঅভিঘাতে অবিচল থাকাকে। ইন্দিরা জীবনীকার ডোম মোরেজ বলেছিলেন–ব্যক্তিগত শোক সবসময় জনসমক্ষে বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত নয় (Private tears are too precious for public display).

রাহুল ভেঙে পড়েছে, মাঝেমাঝেই ভেঙে পড়েছেন সোনিয়াও, কিন্তু ১৯ বছরের পিতৃহারা মেয়েটির রাতারাতি বয়েস যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। শোক কি মানুষকে প্রাপ্তবয়স্ক করে তোলে?

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার শৈশব-কৈশোর কেটেছে টান টান টেনশনে, নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায়। আকস্মিক অসময়ের মৃত্যু এসে বারেবারে টেনে নিয়ে গেছে এদের প্রিয়জনকে। অবিশ্বাস্য রক্তচাপ আর উদ্বেগ কঠিন করে তুলেছে এদের মানসিক গঠন। কোথায় যেন পড়েছিলাম হয়তো অভূতপূর্ব বিলাস আছে এদের জীবনে, কিন্তু বি-লাস্য সেই বিলাস। আসলে জন্মসূত্রেই বেদনার সন্তান, একাকীত্বের শিকার রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। ব্যক্তিগত স্বপ্ন, উচ্চাশা, ভালবাসা, প্রীতি, বর্তমান, ভবিষ্যত কিছুই নেই–শুধুই এক সর্বনাশা ভবিতব্যের দিকে ছুটে চলা।

প্রিয়াঙ্কা কি ভাবী মুজিবর কন্যা হাসিনা বা ভুট্টোর কন্যা বেনজির। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহা তো এদের রাজনীতিতে আসতে প্রলুব্ধ করেছে, প্ররোচনা দিয়েছে। একই রক্তবীজ কি প্রিয়াঙ্কার মানসিক গঠনেরও চলাফেরা করছে না? যাদের নিয়তি রক্তের অক্ষরে তারা চেষ্টা করলেও কী রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে? যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে প্রিয়াঙ্কার কাছে। গনগনে রূপ আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ক্রোধহীন দার্ঢ্য আর নিরাসক্ত কাঠিন্য নিয়ে প্রিয়াঙ্কা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন যোগ্যতা অর্জনের জন্য। বিশাল ভবিষ্যও হয়ত বা অপেক্ষা করবে প্রিয়াঙ্কার জন্যও। নেহরু-গান্ধী পরিবারে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রদীপ এখন প্রিয়াঙ্কার হাতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডঃ গঙ্গাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অদিতি চট্টোপাধ্যায়, কানাই মণ্ডল।

আমেথি এখন

রাজীবের আকস্মিক প্রয়াণে আমেথি হয়ে যায় স্তব্ধ, নির্বাক। হীরক করের প্রতিবেদন এই আমেথি নিয়ে।

বধূবেশে আমেথিতে সোনিয়া

রাতদুপুরে আঁতকে উঠলেন শ্রীরাম সিং। একী শুনছেন তিনি! ঠিক বলছে তো বি বি সি। আগের দিন 'চুনাহ' হয়েছে। আজ সারাদিন পার্টির কাজ সারতে-সারতে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। এ'কদিনধরেই এমনটা চলছে। সবে রেডিয়োটা খুলে বিছানায় গা এলিয়েছেন, তখনই বি বি সি নির্দ্বিধায় ভাসিয়ে দিল আকাশে—'রাজীব গান্ধী অ্যাসিসিনেটেড'। এই ছোট ইংরেজি শব্দের টুকরোগুলো বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। ঘুম থেকে তুললেন ভাই তকলিত সিংকে। তারপর সংগঠিত হল মধ্যরাতের শোকমিছিল।

আগের রাতের ঘটনাগুলি বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন আমেথির শ্রীরাম। শুধু শ্রীরামই নন, ২২ মে সকালে সারা আমেথি মনে করে তাদের পরিবারের কর্তাকে হারিয়েছে তারা। তাই খোলেনি কোনো দোকান। জ্বলেনি কোনো 'চুলা'।

'রাজীবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল পারিবারিক।" বললেন লালবাহাদুর সিং। রাজীব গান্ধীর নির্বাচনকেন্দ্র ভোই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'রাজীব পুনরায় দিল্লির ক্ষমতায় আসতেন। তিনি যে দেবতা। ভগবানের কাছাকাছি—তবুও তো মানুষ। আর মানুষ যে মরণশীল।' মুখ ঢাকলেন লালবাহাদুর।

জগদীশপুর। আমেথির নির্বাচন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মুসলমানদের বাস এখানেই। 'খবর শুনে সবাই হতাশ'—কাঁপা-কাঁপা গলায় কথাগুলো বললেন আমেদ। দোকানদার সে। গলা বুজে এল তাঁর। বাবরি মসজিদ ইস্যুতে অনেক মুসলমানের মতোই তিনিও অসন্তুষ্ট। তবুও-।

জগদীশপুরের মানুষ আরো-একটি কারণে কংগ্রেসের ওপর ক্ষুব্ধ। কেননা, তাঁরা মনে করে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মহম্মদ স্বামী খুন হয়েছেন পার্টির অন্তর্নিহিত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই। মহম্মদ ওয়াসিম জানালেন—'রাজীব গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন স্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁরা অন্তত ২০ বার দিল্লি যাতায়াত করেছেন—যাতে এই খুনের ঘটনার তদন্ত সি বি আই-কে দিয়ে হয়।' জগদীশপুরের বেশিরভাগ মুসলিম এই এক ইস্যুতে কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। মহম্মদ নইম এখানে জনতা দল প্রার্থী। স্বামীর প্রশ্ন তুলে তিনি ভোট চেয়েছেন। পেয়েছেনও। অনেক মুসলিমই নইমকে ছাপ দিয়েছেন। রাজীবকে নয়। ওয়াসিম বললেন,· 'এখানকার মানুষ রাজীবজীর বিষয়ে অখুশি ছিলেন। কেননা, এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন সতীশ শর্মা। আর আমরা কখনো কথা বলতে পারতাম না রাজীবজীর সঙ্গে। মোসাহেবরাই ঘিরে রাখত তাঁকে।'—এটাই ছিল অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক পার্থক্য।

এটাও ঠিক কংগ্রেস বিরোধিতার বেঞ্চে বসা সত্ত্বেও অনেক পেয়েছে জগদীশপুর। গড়ে উঠেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার। বেড়েছে সুযোগ-সুবিধা। তবু চাকরি বেশি পাচ্ছে বাইরের লোকেরাই। বি জে পি-র প্রচারাভিযানে এই ছিল মূল সুর। 'তবে যা-কিছু হয়েছে রাজীব তা ব্যক্তিগতভাবেই করেছেন।' বললেন এক চাকুরিজীবী। তাই বিধানসভার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই ভোট পড়েছে অন্য পার্টিতে। বিশেষ করে বি জে পি-তে। কিন্তু লোকসভার ক্ষেত্রে আমেথির পছন্দ রাজীব। ঘরের ছেলে 'রাজীবগান্ধী'।

'রাজনৈতিক বিরোধিতা আমরা যে-যার জায়গায় থেকে করেছি'—বললেন লালন সিং। এলাকার বি জে পি নেতা। কথা হচ্ছিল গৌরীগঞ্জে তাঁর বাড়িতে বসে। গৌরীগঞ্জ আমেথি নির্বাচন ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় শহর। লালন সিং কথার খেই ধরলেন, 'কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজীবের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল প্রশ্নাতীত। 'এমন ভদ্রলোক লাখে একটা মেলে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, তবু সিকিউরিটি ছিল না তাঁর। যেন সামান্য নাগরিক।'

কিন্তু, রাজীবের এই জনপ্রিয়তার নেপথ্যের কারণ কি? অবশ্যই এখানে তাঁর কর্মকাণ্ড'—সটান জবাব দিলেন মহম্মদ কাশিম। জগদীশপুরের জনতা দলের কর্মী। জানালেন, 'পুরো অঞ্চলটাই ছিল পতিতজমি। পতিতজমিও যে কাজে লাগে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন রাজীব'। কথার সূত্র ধরলেন জামো গ্রামের হরিশ মিশ্র—'উন্নয়ন? এখানে এখন দু'টো হাসপাতাল। সমস্ত কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। রাজ্য জল-নিগমের মাধ্যমে জলসেচ-ব্যবস্থা হয়েছে। জেলার যে-কোনো স্থানে বাস চলেছে

'এখান থেকে রাজীব সাংসদ হবার আগে কিন্তু এমনটা হয়নি। ১০ বছর আগে এখান

দিয়ে একটা গাড়ি গেলেও লোকে ফ্যালফ্যাল করে দেখত। এখন রাজ্য সড়কের মাধ্যমে আমাদের গ্রাম জগদীশপুর গৌরীগঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত। ফিদিন শ'য়ে-শ'য়ে গাড়ি যাচ্ছে-আসছে।' জানালেন ভোই গ্রামের লালবাহাদুর সিং। একই গ্রামের পণ্ডিত দেবী দত্ত বললেন, ভোই গ্রামে বদলি হলে আগে সরকারি অফিসাররা ভাবতেন এটা শাস্তিমূলক বদলি। এখন কিন্তু তাঁরা নিজেরাই আসছেন। তাঁরা ছুটিও চান না। এখন গ্রামে জলসেচের জন্য বড় দীঘি কাটা হয়েছে। ফলে সারাবছরই চাষবাস হচ্ছে। আগে ৬ মাসের বেশি চাষই হত না। তখন সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন বা বাসস্টপে যাবার জন্য ১৬ মাইল হাঁটতে হত। এখন সবকিছুই হাতের কাছে।'

সঞ্জয় গান্ধী যখন সাংসদ তখনই আমেথির উন্নয়নের সূচনা। আর আজ রাজীব গান্ধীর জন্যই আমেথির এত 'বোলবোলা'। সঞ্জয়ের আমলেই আমেথিতে প্রথম ইন্দো ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট শুরু। সঞ্জয় '৮০ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর '৮১-তে আমেথি থেকেই নির্বাচনে প্রথমবার জিতে আসেন রাজীব। এই আমেথির সঙ্গে রাজীবের ছিল নাড়ির সম্পর্ক। সে-সম্পর্ক ছিন্ন হল এক

কি হয়নি রাজীবের আমলে এখানে। বড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস, হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিকস্ এবং দু'টো বড় সিমেন্টের কারখানায় হাজার-হাজার স্থানীয় ছেলে কাজ করছে এখন। আমেথির যোগাযোগ-ব্যবস্থার তো কোনো তুলনা নেই। রাস্তার পিচে যে কারো মুখ দেখা যায়।

এখন স্মৃতি হাতরাচ্ছেন আমেথির মানুষ। 'সালটা ১৯৮৭'। রাজীবজী মিটিং করছেন নন্দমাউতে। বলে চললেন গৌরীগঞ্জের প্রবীণ গিরিরাজ সিং—আমিও মিটিংয়ে গেলাম, বসলাম সবশেষে। আমি কোনো সাংসদ ছিলাম না। ছিলাম স্বাধীনতা-সংগ্রামী। জীবন শুরু করেছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রাম দিয়ে। কিন্তু রাজীবজী আমায় লক্ষ্য করলেন। জনতা থেকে তুলে এনে মঞ্চে তাঁর পাশে বসালেন। তিনি সম্মান দিতেন সবাইকে।'

রাজীবের সঙ্গে সোনিয়াও বহুবার এসেছেন এখানে। সে-সব স্মৃতি। অতীত। এখন আমেথির মানুষের সে-সবই সম্বল। তাই হাতড়ে বেড়ানো।

২২ তারিখ সাতসকালে জগদীশপুরে ঢুকতেই মুখোমুখি হওয়া গিয়েছিল এক শোক মিছিলের। সকলের হাতে কংগ্রেসের পতাকা। রাজীবের কাট-আউট। বুকে কালোব্যাজ। স্তব্ধ মিছিলে মাঝে-মাঝে রাজীবের নামে স্লোগান নির্জনতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

গৌরীগঞ্জ, জগদীশপুর, ভোই, জামো—সর্বত্রই এক চিত্র। দোকানপাট সব বন্ধ। অনেক বাড়ির মাথায় অর্ধনমিত পতাকা। জামো গ্রামে একটি বিশাল বটগাছের ডালে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাজীব গান্ধীর কাট-আউট। জটলা।

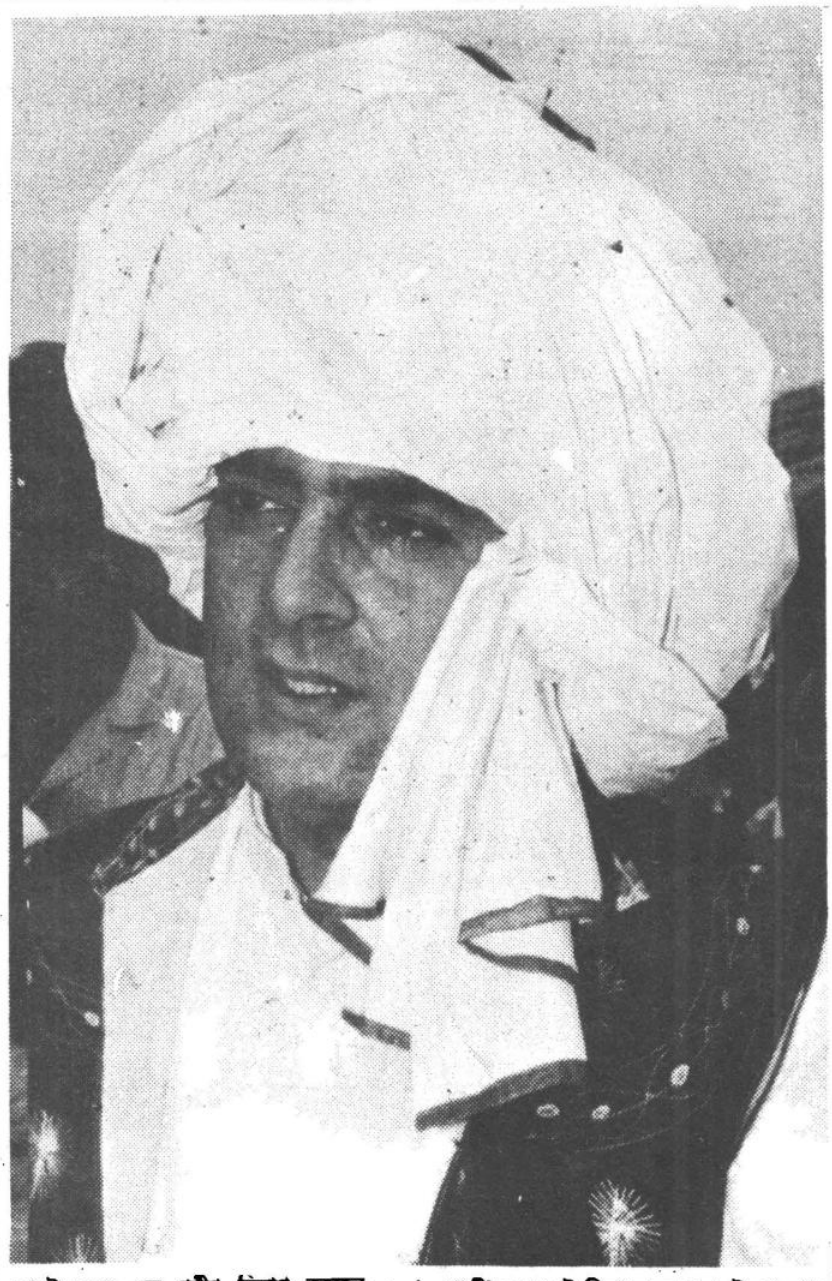

তারই মধ্যে এক প্রবীণ বিলাপ বকছেন—ভগবান এ তুম কেয়া কিয়া', কিউ রাজীব কো ছিন লিয়া?' আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিলেন বেশ-কিছু দোহাতি রমণী। বললেন, 'রাজীবজী কা বিচার থা, পুরা আমেথি এক পরিবার হ্যায়'। গত এপ্রিল থেকে আমরা সোনিয়াজীর সঙ্গে লেগেছিলাম। গাঁও কে গাঁও ঘুরেছি তাঁর সঙ্গে। রাজীব এসে উঠতেন গেস্ট হাউসে।

যদি আমেথির যে-কোনো মানুষকে ডেকে এক প্রশ্ন করা হয়—রাজীবজীর পর আমেথিতে তাঁরা কাকে চান? সবাই একবাক্যে বলবেন সোনিয়াজী নয়তো প্রিয়াংকাজী। দু'জনেই আমেথি চষে বেড়িয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে হাজার-হাজার মানুষকে চেনেন। শ্রীরাম সিং-এর উচ্ছ্বাস—'মিলিয়ে নেবেন আমার কথা, প্রিয়াংকাই আগামী ভারতের আরেক ইন্দিরা গান্ধী'। অনেকেই প্রিয়াংকাকে চান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেউ রাহুলের নাম একবারও তোলেননি। প্রিয়াংকার বয়স কম বলে স্থানীয়দের অভিমত, একবছর সোনিয়াই চালিয়ে দিন রাজীবেরই পদচিহ্ন ধরে। তারপর পরিণত হয়ে হাল ধরুন প্রিয়াংকা।

কিন্তু আমেথির মানুষের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন এখন একটাই : আমেথির হর্তাকর্তা-বিধাতা কি হবে গান্ধী পরিবারই। রাজীবের পর সোনিয়া, সোনিয়ার পর প্রিয়াংকা, প্রিয়াংকার পর রাহুল—তারপর আর কোনো গান্ধী। আর তাঁরা কি আসবেন বারবার বুলেটের নির্মমতা—বিস্ফোরণের নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে, অন্য কোনোভাবে নয়? ওদের আকাঙ্ক্ষা : আমেথিতে রাজীবের উত্তরসুরিরাই আসুন। কিন্তু বুলেট-বিস্ফোরণের মাধ্যমে নয়। কখনোই নয়।

"রাজীবজী ছিলেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নিঃস্বার্থ বড়দা"

শ্রীলঙ্কায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বন্দুকের কুঁদোর আঘাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এক বাঙালি—"ব্ল্যাক ক্যাট" অসিত শীল। এক সাক্ষাৎকারে অসিতবাবু এঁকেছেন রাজীবের সম্পূর্ণ একটি ছবি।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—এই দীর্ঘকায়, সুঠাম, আপাতরুক্ষ ভদ্রলোকের। নাম অসিতবরণ শীল। পদমর্যাদায় ইনি কলকাতা পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর—গোয়েন্দা বিভাগের 'বোম-স্কোয়াডে' (bomb squad) কর্মরত। উনি ১৯৭৭-এ কলকাতা পুলিসে যোগ দেন। ওঁনার কথা এবার শুনি ওঁনার মুখেই।

প্র : অসিতদা, ১৯৭৮-এ ব্যারাকপুরে পুলিস ট্রেনিং পাস করেই আপনি কলকাতার রাজভবনে পোস্টেড হন?

উ : হ্যাঁ, আমি গর্ভনরের পার্সোন্যাল সিকিউরিটির অফিসার (পি এস ও) ছিলাম।

প্র : এই সময় থেকেই কি বাইরের ভি ভি আই পি-দের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রপাত?

উ : খানিকটা বলতে পার তাই। যেহেতু গর্ভনরের পি এস ও ছিলাম বিভিন্ন কনভোকেশনে গর্ভনরের নিরাপত্তার হাজির হতাম। ফলে ভি ভি আই পি নিরাপত্তার একটা রূপরেখা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

প্র : এরপর ১৯৮২-তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সারাদেশ থেকে তরুণ উদ্যোগী সাহসী পুলিস অফিসারদের বাছা হয়। আপনিও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

উ : হ্যাঁ, ১৯৮২-তে ম্যাডাম শ্রীমতী গান্ধীর জন্য স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। সিলেকশন পরীক্ষা হয় দিল্লিতে। যতদূর মনে পড়ছে শারীরিক সক্ষমতা ছাড়াও পুঁথিগত বিভিন্ন শক্ত প্রশ্ন ছিল। যাই হোক আমি সিলেক্টেড হয়ে গেলাম।

প্র : আপনি কী তখন দিল্লির আওতায়?

জনতার আমদরবারে রাজীব-সোনিয়া। পাশেই ব্ল্যাক-কাট অসিত শীল।

উ : হ্যাঁ, আমার ডেপুটেশন ছিল কলকাতা থেকে দিল্লি পুলিসে। ম্যাডামের মৃত্যুর দিন আমার ডিউটি ছিল বিকেলে। সকালেই শুনি সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা। ম্যাডামেরও প্রায় ছায়াসঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম তাই যেন প্রিয়জন হারানোর ব্যথা পেয়েছি। আমরা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মোট প্রায় ২৬ জন একটা কষ্টসাধ্য ট্রেনিং-এর বাধা পেরিয়ে বাসস্থানের বাইরে ম্যাডামের যাবতীয় নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

প্র : আচ্ছা, প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসাবে রাজীবের তখন নিরাপত্তা কেমন ছিল?

উ : যেহেতু পাঞ্জাবের শিখজঙ্গীদের হিটলিস্টে নেহরু-গান্ধী পরিবারের সবারই নাম আছে। সুতরাং রাজীবজী তখন একজন সাধারণ এম. পি. হলেও আমি, রবি, মাহিন্দর, রামান্না তাঁকে শয়নে-স্বপনে জাগরণে অনুসরণ করতাম।

প্র : আচ্ছা, রাজ্য তথা কলকাতা পুলিসের আপনিই একমাত্র প্রতিনিধি যিনি এস পি জি-তে ছিলেন, অন্য আর কেউ সুযোগ পাননি কেন?

উ : (উচ্চহাসি হেসে) বোধহয় বাঙালি ঘরকুনো বলেই।

প্র : আচ্ছা, এস পি জি বা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ কবে তৈরি হল?

উ : মূলত ম্যাডামের মৃত্যুর পরই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হল। এরই ফল পরিণতি স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা সংক্ষেপে এস পি জি তৈরি হয় ১৯৮৫ সাল নাগাদ।

প্র : আচ্ছা, একটা কথা ম্যাডামের সঙ্গে দেশের বাইরে

উ : ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সর্বশেষ রাজনৈতিক সফর ছিল গ্রিস, সাইপ্রাস, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদিতে। ওটাই আবার আমার প্রথম বিদেশ সফর।

প্র : অসিতদা, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ অবধি। এই সময় রাজীবের সঙ্গে দেশের বাইরে ক'বার গেছেন?

উ : (মৃদু হেসে) অগুনতিবার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেতেই গিয়েছি—আমেরিকা, ইংল্যান্ড, (লন্ডন) বার্মা (মায়ানমার), কিউবা, রাশিয়া, চীন, জাপান, কানাডা, ভাটুভার। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আমার শেষ সফর চিনের বেজিংয়ে।

প্র : আপনাদের সঙ্গে রাজীবের সম্পর্ক কেমন ছিল?

উ : ঠিক যেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নিঃস্বার্থ বড়দা। এমনই ছিলেন স্যার। কারোর ছেলেমেয়ের খবর নিচ্ছেন, কারোর হোমসিকনেস ঠাট্টা-ইয়ার্কিতেই উড়িয়ে দিচ্ছেন, মার্কেটিং করার জন্য আমাদের ছুটি দিচ্ছেন, আমরা সবাই যেন একই সুখ-দুঃখের অংশীদার। উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমরা তারই বডিগার্ড এই অনুভূতিটি হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে শুধু চাকরি করার জন্য না, ভালোবাসাতেও আমরা সমস্ত বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতাম।

প্র : আমি শুনেছি হোলি এবং নববর্ষে রাজীব গান্ধী আপনাদের উইশ করে বিদেশেও আলাদাভাবে কার্ড পাঠাতেন?

উ : শুধুই হোলি, নববর্ষ নয়, আমাদের অনেককে জন্মদিনেও আলাদাভাবে শুভেচ্ছা জানাতেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ফলে যা একবার শুনতেন মনে ফটোকপি হয়ে

যেত।--যে-কোনো ছুতোয় আমাদের উপহার দিতেন।

প্র : সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

উ : তীষণ হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। আমাদের নিমন্ত্রণ করে মাঝে-মাঝেই নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

প্র : শোনা যায়, শ্রীলঙ্কায় বলে রাজীব গান্ধীর প্রাণ আপনিই রক্ষা করেন?

উ : আমি একা নই, আমার সতীর্থ জ্যামুয়েলও ছিল। তখন 'গার্ড অব অনার' হচ্ছে। আমরা এস পি জি-রা সবসময়ই নজর রাখি স্যারের গতিবিধির ওপর। হঠাৎ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বিপদের আঁচ পেলাম। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে দেখতে পেলাম এক সেনা রাইফেলের কুঁদো স্যারের কপাল বরাবর চালিয়েছে। নিজেদের রিফ্লেক্সেই আমি আর জ্যামুয়েলের যেন দায়িত্ব বিভাগ হয়ে গেল। জ্যামুয়েল সেনাটির ওপর ঝাঁপাল, আমিও এক ঝটকায় স্যারকে বিপদমুক্ত করলাম।

প্র : এই সাহসিকতার কোনো পুরস্কার পাননি?

উ : রাজীব গান্ধীজী নিজেই সুপারিশ করে দিয়েছিলেন, পুরস্কার তো পাবেই। কিন্তু ও পুরস্কার জীবনে অনেক পেয়েছি। এখনও পাচ্ছি কলকাতা পুলিসে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ঐ ঘটনা ঘটার পরই 'স্যার' আমাদের পিঠ চাপড়ে বলে ওঠেন, 'ওয়েল ডান অসিত, জ্যামুয়েল।

প্র : রাজীবের খুব কাছের নিরাপত্তা বলয়ে আপনারা কতজন থাকতেন?

উ : মোটামুটি ৬ জন।

প্র : গত ৬ মে রাজীব যে নির্বাচনী প্রচারে কলকাতা এসেছিলেন কলকাতা পুলিসের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আপনিও ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে?

উ : হ্যাঁ, ছিলাম।

প্র : এবারে অনেক জায়গায় দেখা গেছে, কলকাতায় রাজীব বেশি করে জনগণের কাছে যাবার চেষ্টা করছেন, নিরাপত্তা বিধিনিষেধ মানছেন না, যে-কোনো লোককে কাছে আসতে দেবার জন্য সিকিউরিটিকে বলছেন—এই প্রবণতাকে কী আপনি বিপজ্জনক মনে করেন না?

উ : বিপজ্জনক তো বটেই। তবে জনপ্রিয় নেতা, জনগণের নেতা হতে গেলে জনগণের কাছে তাঁকে যেতেই হবে। নিরাপত্তায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাজ যথার্থ নিরাপত্তা দেওয়া।

প্র : এবারে প্রায় বছর দুয়েক পরে রাজীব আপনাকে চিনতে পারলেন?

উ : (ম্লান হেসে) 'হয়তো ওঁনার সঙ্গে শেষ দেখা বলেই সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবর নিলেন। বললেন, 'অসিত, সাউথ ব্লকে ফিরছিই। দেখে নিও।' 'এস পি জি-র ইনারিং, আউটার রিং-এখানেও তো তাই। অসিত, আমাদের ছাড়লে কেন? হায়রে, 'স্যারই' ছেড়ে গেলেন সবাইকে। অভিজিৎ বিলিভ মি, আমি রাজনীতির লোক নই—রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের উপকার বা অপকার করেছিলেন কিনা এ সম্বন্ধেও আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে রাজীব গান্ধীর শত্রু-মিত্র সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন রাজীব আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক। নিজের অতি নিকটজনের মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। স্মৃতি কী সততই দুঃখের?'

বাতাস কি একটু ভারি হয়ে গেল। টাফম্যান অসিত শীল একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গেল হঠাৎই। সম্ভবত অতীত রোমন্থনে ব্যস্ত অসিত শীল। আর বিরক্ত করলাম না। বোম স্কোয়াডের অফিসারদের ঘরের বাইরে পা বাড়ালাম। ■

সাক্ষাৎকার : অ. মু.

মিশতে চেয়েছিলেন রাজীব

রাজীব এবারের নির্বাচনে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিলেন—সেটাই তাঁর কাল হল। এক সাক্ষাৎকারে এ-কথা জানিয়েছেন কলকাতায় রাজীবের নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লোম-স্কোয়াডের অফিসার-ইন-চার্জ পঞ্চানন দাস।

কোনো ভি ভি আই পি কলকাতায় এলে তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে স্পেশাল ফোর্স (এস টি এফ) চালু করা হয়েছিল ১৯৮৭ সাল নাগাদ। প্রথম থেকেই এস টি এফ মূলত যে দুই অফিসারের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল তাদের একজন শ্রী উমাশঙ্কর লাহিড়ী, অপরজন শ্রী পঞ্চানন দাস। রাজীবের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে এস টি এফের কর্মকুশলতা জানতেই হাজির হলাম ও সি বোম স্কোয়াডের কাছে।

প্র : আচ্ছা রাজ্যের বাইরে থেকে যখন ভি ভি আই পি-রা কলকাতায় আসেন তখন নিরাপত্তা বিষয়ে কোন্ অফিসার দায়িত্ব থাকেন?

উ : সাধারণত ডি সি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন। ডি সি (এস বি) কো-অর্ডিনেট করেন এস টি এফ এবং এস পি জি এবং অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে।

প্র : এস পি জি-এর সঙ্গে কলকাতায় এস টি এফ-এর কর্মবিভাজন কিভাবে হয়?

উ : সাধারণত কোনো ভি ভি আই পি কোনো রাজ্যে গেলে তার নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রধানমন্ত্রী এলে তো বটেই। এস পি জি-র কাজ তখন নিকটতম নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা। অন্যান্য কাজ যেমন ভিড় সামলান, রাস্তার ধারের উঁচু বাড়ি ইত্যাদিতে নজর রাখা, যে রাস্তায় ভি আই পি যাবেন সেটি মোটামুটি ট্রাফিকহীন করা (অন্তত কিছুসময়ের জন্য) ইত্যাদি ইত্যাদি। রি-ডাউনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও রাজ্য পুলিসকে করতে হয়।

প্র : ভি ভি আই পি এসকর্টে এস টি এফ থেকে সাধারণত আপনারা কতজন যান?

উ : সেটা ভি ভি আই পি কেমন তার ওপর নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী এলে সাধারণত আমাদের পুরো স্ট্রেংথ নিয়েই যাই।

প্র : কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আপনারা ভি ভি আই পি নিরাপত্তায় ব্যবহার করেন?

উ : সাধারণত বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদি—যেমন স্টেনগান ইত্যাদি।

প্র : এবারে ৬ মে রাজীব গান্ধী যখন নির্বাচনী সফরে কলকাতা এলেন তখন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?

উ : খবরের কাগজে তো বেরিয়েছে। তবু বলছি দেশপ্রিয় পার্ক, টালা পার্ক, হাওড়া ময়দান, বড়বাজার, সত্যনারায়ণ পার্ক।

প্র : আচ্ছা একটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারছি না—এইসব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে মিনিটে ক'টি করে গুলি বেরোয়?

উ : সাধারণত ৬০০ থেকে ৭০০।

প্র : এবারের রাজীবের নিরাপত্তায় দিল্লি থেকে কতজন নিরাপত্তাকর্মী এসেছিলেন?

উ : যতদূর মনে পড়ছে দিল্লি পুলিসের ২/৩ জন এসেছিলেন।

প্র : আচ্ছা আপনি তো প্রধানমন্ত্রী অবস্থাতেও রাজীবের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন কলকাতায়। এবারে নির্বাচনী সফরে কোনো বৈশিষ্ট্য কী আপনার চোখে পড়েছে?

উ : হ্যাঁ, উনি আমাদের বলছিলেন মানুষকে না-আটকাবার জন্য। বেশি করে জনতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন।

প্র : বিস্ফোরণ ঠেকাতে মেটাল ডিটেকটরের মতো কোনো যন্ত্র কি ভারতে এখন ব্যবহার হয়?

উ : মেটাল ডিটেকটরে তো অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা তা বোঝা যায়। ভি ভি আই পি নিরাপত্তার প্রচুর সংখ্যা পোর্টেবল হ্যান্ড মেটাল ডিটেকটরও থাকে।

কিন্তু বিস্ফোরক খুঁজে বার করা বা আটকাবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম একসপ্লোসিভ ডিটেকটর। এই যন্ত্রে একটি মাইকার আছে, তাতে কম্পিউটার রিডিং-এ ফুটে ওঠে একসপ্লোসিভের কথা। এই একসপ্লোসিভ ডিটেকটর অনেক ধরনের হয়—পি ডি ওয়ান, টু---পি ডি ফাইভ।

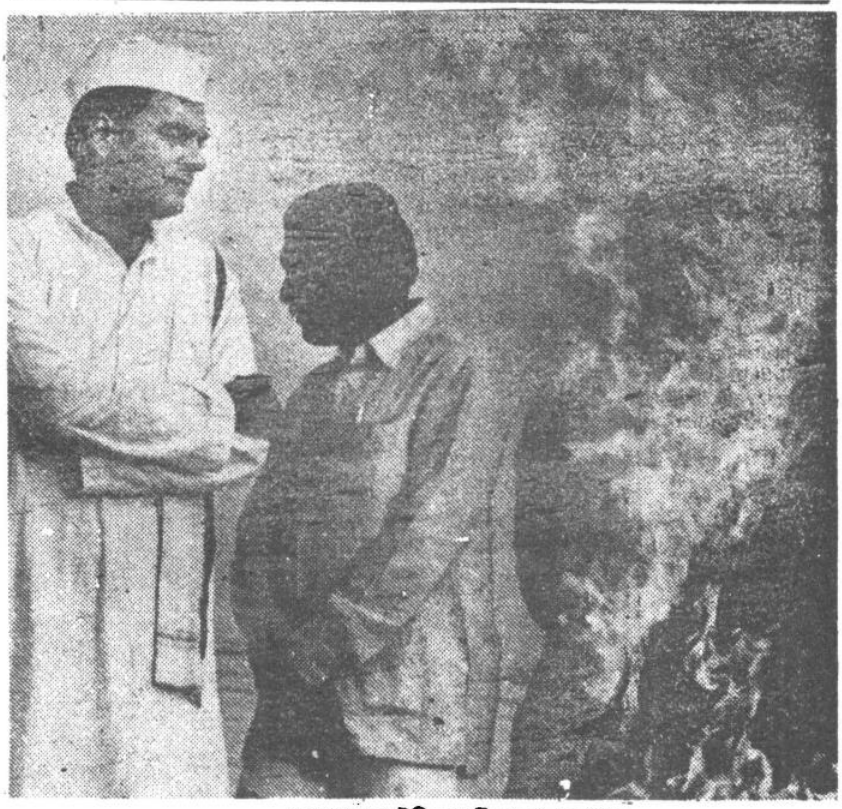

১৯৬৪। জ্বলছে ইন্দিরার চিতা। পাশে রাজীব

প্র : আচ্ছা, আরো সুষ্ঠভাবে ভি ভি আই পি নিরাপত্তার জন্য কী এস টি এফ-এর আরো আধুনিকীকরণ হলে ভালো হয়?

উ : নিশ্চয়ই। ওয়ারলেসের আরো উন্নতি দরকার। বিদেশে স্বয়ংক্রিয় ছোট অস্ত্রাদি প্রভূতভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আমরাও সেগুলি ব্যবহার করতে পারি। শুধু ভি ভি আই পি নিরাপত্তার জন্যই আলাদা সেল খোলা যেতে পারে। এছাড়া দাঙ্গাদমন সেল, উগ্রপন্থাদমন সেল ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগ থাকবে। ■

বাবার দেওয়া ঘড়ি ব্যবহার করতেন রাজীব

পারিবারিক জীবন কেমন ছিল রাজীবের—জানাচ্ছেন সুদীপ্ত চক্রবর্তী।

বহ্নিমান চিতার লকলকে অগ্নিশিখাগুলো তখন আকাশকে ছুঁতে চাইছিলো, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ নিজের চন্দন-জঠরে সে ধারণ করে আছে ভারতের এক অতীত প্রধানমন্ত্রীকে–যে সব অর্থেই অতীত এখন। অথচ এরকম হবার কথা ছিল না। রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন ছিল অন্যরকম। প্রথম পাঁচ বছরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং নিজের রাজনৈতিক পরিণতিকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যখন গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মৃত্যুদূত তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিল। নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেননি রাজীব, কিন্তু জীবনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চরম মাশুল নিজের প্রাণের বিনিময়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

শ্রীপেরুমপুদুরের বক্তৃতামঞ্চ থেকে তিনমূর্তি ভবন হয়ে শক্তিস্থল পর্যন্ত রাজীবের শেষযাত্রায় সামিল হয়েছেন বহু মানুষ। শোকমূর্ছ গোটা জাতি, গোটা দেশ। কিন্তু ফুল, ধূপ, ধোঁয়া শিখার মাঝখান দিয়ে বারবার যে মুখগুলো ভেসে উঠছিল, সেখানে শোকের পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিত্ব, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে না ফেলার অটল বাসনা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। বাবার অন্তিমশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে রাহুল এবং প্রিয়াংকো যেভাবে নিজেদের বয়সকে ছাপিয়ে গেল, তাতে এই সদ্য যুবক-যুবতীকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। এবং সোনিয়া, কালো চশমার আড়ালে মুখ ঢেকে অন্তরের ব্যথা-বেদনা কাউকেই বুঝতে দেননি। কঠিন আত্মসংযমে কাজ করে গেছেন। ভেবেছেন পুরনো দিনগুলোর কথা।

২৩ বছরের দাম্পত্য জীবন সোনিয়া রাজীবের। কেমব্রিজে আলাপ তারও আগে। আদর্শ দম্পতির উদাহরণ হিসাবে রাজীব-সোনিয়াকে খাড়া করা যায়। ছয়ের দশকের গোড়ায় কেমব্রিজে এক বন্ধুর বাড়িতে দুজনের আলাপ। প্রথম ডেটিং এক গ্রিক রেস্তোরাঁয়। রাজীব নিজেই পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, এ'রকম মেয়েই আমার দরকার। প্রেমে পড়ে গেলাম। খুবই সমঝদার মেয়ে সোনিয়া। বেশ খোলামেলাও"। ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে বিয়ে হয়ে গেল জেলে থাকতে জওহরলাল নেহরু নিজেহাতে একটি খদ্দরের শাড়ি বুনেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের বিয়ের সময় সেটি পরেছিলেন। সেই একই শাড়ি পরে গান্ধী পরিবারের গৃহবধূ হয়ে এলেন সোনিয়া। সেই থেকেই তিনি গান্ধী পরিবারের "বহুরানী"। নিজের আচার-ব্যবহার, চালচলন সবকিছুই ভারতীয় করে তুলেছিলেন তিনি। রাজীবের চিতায় অগ্নিসংযোগ করার ঠিক আগে সোনিয়া যখন মৃতস্বামীর পা ছুঁয়ে নমস্কার করলেন, তখন শুধু এতদিনের মায়া-মমতা ভালোবাসাকেই নয়, নিজের ভারতীয় সত্তাকেও চূড়ান্ত সম্মান জানিয়ে গেলেন এই ইতালীয় কন্যা।

সেই সময় সোনিয়ার নিশ্চয় মনে পড়ছিল গোড়ার দিকের কথাগুলো। রাজীব চিরকালই চুপচাপ, শান্ত, ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বিশ্বাসী। সঞ্জয় গান্ধীর মতো স্বেচ্ছায় রাজনীতি করতে তিনি আসেননি। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পরই "মাকে সাহায্য করার জন্য" তাঁর রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব। আসলে তাঁকে চেয়েছিলেন মিসেস গান্ধী-ই। সঞ্জয়ের অকালমৃত্যুর পর নির্ভর করার মতো একটা কাউকে দরকার ছিল ইন্দিরাজীর। তাই রাজীবের আগমণ। রাজনৈতিক শিক্ষা বলতে গেলে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু সোনিয়ার তীব্র আপত্তি। রাজীবের রাজনীতির মঞ্চেও প্রবেশের দারুণ বিরোধী ছিলেন সোনিয়া। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের সামনে ধোপে টেঁকেনি সোনিয়ার আপত্তি।

স্বগৃহে রাজীব একেবারেই ঘরোয়া। আদর্শ স্বামী। স্নেহপ্রবণ পিতা। এ-ব্যাপারে অনেক দিক দিয়েই জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর মিল পাওয়া যায়। আসলে ছোটবেলায় দাদাজীর খুব আদরের নাতি ছিলেন রাজীব। বহু জায়গায় ঘুরেছেন নেহরুর সঙ্গে। যে আদর্শ, যে শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন নেহরু, তা স্বাভাবিকভাবেই সংক্রামিত হয়েছিল রাজীবের মধ্যেও। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েও দেশে-বিদেশে নেহরু বারবার তাঁর কথায় ঘুরেফিরে এসেছেন। তাঁর কাজে-কর্মে, দৃষ্টিভঙ্গিতে নেহরুর অনুচ্চার উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো ছিল।

'রাজীব' নামটিও নেহরুর দেওয়া। ইন্দিরার প্রথম পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয়েছিল 'রাজীবরত্ন'। শ্রী কমলা নেহরুর নামানুসারে এই নাম। 'কমল' এবং 'রাজীব' দুয়েরই অর্থ 'পদ্মফুল'। 'রত্ন' শব্দের অর্থ জহর। নিজের নাম এবং পত্নীর নাম মিলিয়ে নেহরু নাম রেখেছিলেন 'রাজীবরত্ন'।

পারিবারিক ব্যাপারে রাজীব চিরকালই যথাসম্ভব কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধের কথা সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও রাজীব বিজয়লক্ষ্মীকে কোনোদিনই অসম্মান করেননি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নিজের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে রাজীবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ।

তবে নিঃসন্দেহে রাজীবের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিলেন বাবা ফিরোজ গান্ধী। বাবার কথা উঠলেই অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। ফিরে আসত অতীত। ফিরোজ গান্ধীর নিজের ব্যবহার-করা একটি পুরনো রোলেক্স ঘড়ি তাঁর কাছে ছিল। অতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ঘড়িটি তিনি ব্যবহার করতেন।

এখন এসবই শেষ। প্রায় একদশক ধরে এই দিনটির জন্যই ভয় পেয়ে এসেছেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি জানতেন, তাঁর সুখের সংসারকে ধসিয়ে দেবার জন্য একজন উন্মাদ হত্যাকারীর একমুহূর্তের সক্রিয়তাই যথেষ্ট। হলও ঠিক তাই। ২৩ বছরের সুখী, সফল দাম্পত্যজীবন শেষ হল বিস্ফোরণ এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়ে।

এখন রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রিয়াংকোর মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতের শাসনকর্ত্রীর সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে ইন্দিরার ছায়াও দেখেছেন অনেকে। স্বয়ং বেনজির ভুট্টো জানিয়ে গেছেন, আজ থেকে কয়েক বছর বাদে প্রিয়াংকোকে দিল্লির মসনদে দেখলে তিনি আশ্চর্য হবেন না। প্রিয়াংকো রাজনীতিতে আসবেন, কি আসবেন না তা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বর্তমান সত্য হল ইন্দিরা-সঞ্জয়-রাজীব অর্থাৎ গান্ধী পরিবারের দু-দুটো প্রজন্ম আপাতত অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সোনিয়া গান্ধীর রাজনীতিতে না-আসার সিদ্ধান্তের পিছনের কারণ খোঁজার জন্য আর বোধহয় খুববেশি পরিশ্রম করার দরকার নেই।

রাজীব গান্ধী ।। ১৯৪৪—১৯৯১

১৯৪৪-১৯৯১—রাজীব গান্ধীর জীবনের এই সাতচল্লিশ বছরের আনুপার্বিক

ইতিহাস তুলে ধরেছেন **অপূর্ব কুমার দাস।**

রাজীব গান্ধী আর নেই, এ কথা আজ সকলেই জানেন। পৌনে ৪৭ বছরের রাষ্ট্রনায়ক মর্মান্তিক জীবনাবসানের পর অনেকেই তাঁর গতিময় জীবনের নানান দিকের কথা তুলে ধরছেন। প্রয়াত নেতার জন্ম থেকে শুরু করে কর্মজীবনের নানা ঘটনা আজ সকলের আলোচনার বিষয়।

সময়টা ছিল ১৯৪৪ সাল। দেশ জুড়ে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেই বছর আগস্ট মাসের ২০ তারিখে জওহরলাল নেহরুর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর কোলে এল দেবশিশুর মতো এক ফুটফুটে ছেলে। বাবা ফিরোজ এবং মা ইন্দিরা ছেলেকে পেয়ে তো মহাখুশি। অনেক ভাবনাচিন্তার পর নামকরণ হল রাজীব।

বছর কয়েক ঘুরতে না ঘুরতেই দাদু জওহরলাল নাতি রাজীবকে স্কুলে পাঠালেন। আর যে সে স্কুল নয়, বিখ্যাত দুন স্কুল। কিছুদিন পর ছোট সঞ্জয়ও দুন স্কুলে পড়তে আসেন। দুন স্কুলেই রাজীবের শৈশব কাটল। স্কুলের পাঠ শেষ করার পরই পরিবারের সদস্য চাইলেন রাজীব উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে ইংল্যান্ড যাক। মাতামহ নেহরুও চাইতেন রাজীব তাঁর মতো বিলেতে গিয়েই পড়াশুনা করুক। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর রাজীব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংপড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিলেতে গিয়ে ভর্তি হলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

ইংল্যান্ডে পড়ার সময়েই কেমব্রিজে ইতালির সোনিয়া মাইনোর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। লাজুক ও নম্রস্বভাবের রাজীব প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যান সোনিয়ার। আলাপও ক্রমশ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। এদিকে ইংল্যান্ডে পড়ার সময়েই রাজীবের জীবনে এক আঘাত নেমে আসে। '৬৪ সালের ২৭ মে জওহরলালের মৃত্যু হয়। এর চার বছর আগে ৬০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পিতা ফিরোজের জীবনাবসান হয়।

সে যাই হোক, পরে রাজীব ইংল্যান্ড থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। দেশে ফিরেই কিছুদিনের মধ্যে পান কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স। পরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট হিসাবে কাজে যোগ দেন। রাজীবে বরাবর আকাশে ওড়ার নেশা ছিল। তিনি চাইতেন নীল আকাশে পাখির মতো ভেসে বেড়াতে।

এদিকে '৬৮ সালে নয়াদিল্লিতে রাজীব-সোনিয়ার বিয়ে হয়ে যায়। কয়েক বছরের

গান্ধী পরিবার। পারিবারিক অ্যালবাম থেকে।

মধ্যে রাজীব প্রিয়াঙ্কা ও রাহুল নামে মিষ্টি দুটি ছেলেমেয়ের জনক হন। ছেলেমেয়ে, প্রিয়তম পত্নী সোনিয়া এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে পাইলটের চাকরি এই নিয়েই রাজীবের নিরুপদ্রব জীবন কেটে যাচ্ছিল।

'৮০ সালের মাঝামাঝি এই শান্ত ধীরস্থির পাইলটের জীবন নাটকীয়ভাবে মোড় নেয়। ওই বছর ২৩ জুন বিমান-দুর্ঘটনায় ছোট ভাই সঞ্জয়ের মৃত্যুই জীবনের গতিপথ পাল্টে দেয় রাজীবের। ভাই সঞ্জয় '৭৫ সাল থেকে মা ইন্দিরার রাজনৈতিক জীবনে পাশে পাশে থেকেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এক বিরাট শূন্যতা দেখা গেল। আর তা পূরণের জন্য মা এবং আত্মীয়-পরিজন সমেত সবদিক থেকে চাপ আসতে লাগল রাজীবের ওপর। এতদিন রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও আর এড়িয়ে যেতে পারলেন না। '৮১ সালেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর ফলে আমেথির শূন্য লোকসভার আসনটি পূর্ণ করার জন্য উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হল। রাজীব ওই উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জিতে সংসদে প্রথম পা রাখলেন। এরপরে ধীরে-ধীরে মায়ের কাছে রাজনীতির পাঠ নিতে পোক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। '৮২ সালে নবম এশিয় ক্রীড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার পর মা ইন্দিরার ছেলের সুনাম অনেকগুণ বেড়ে গেল। এশিয়াড চলাকালীন আয়োজন ত্রুটিহীন করতে তিনি যেভাবে রাতদিন খেটেছিলেন তার প্রশংসা অনেক প্রবীণ নেতাই করেছিলেন।

'৮৩ সালে রাজীবকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে শুরু হয় তাঁর আরো বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবন। কিন্তু '৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁর জীবনে আসে সবচেয়ে দুঃখের দিন। মা ইন্দিরা নিজের বাসভবনে দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন।

ইন্দিরাজী মারা যাওয়ার সময় রাজীব দলীয় কাজে পশ্চিমবঙ্গ সফর করছিলেন। খবর পেয়ে রাজধানীতে ফিরে তিনি কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় ইন্দিরাজীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশে জ্বলেছিল দাঙ্গার আগুন। রাজীব প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই দেশের অশান্ত পরিস্থিতিকে সুনিপুণ দক্ষতায় শান্ত করেন। '৮৪ সালেই অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে রাজীবের নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দল বিপুলসংখ্যা লাভ করে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কংগ্রেস চার শতাধিক আসন পায়—যা ছিল সর্বকালীন রেকর্ড। আমেথি কেন্দ্র থেকে রাজীব দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। রাজীব '৮৪ থেকে '৮৯ পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি করেন। বেশ কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করেন।

তিনি সব প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালান।

পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে '৮৫ সালে তিনি রাজীব-লাঙ্গোয়াল চুক্তি করেন। অসমে ছাত্র-আন্দোলন থামাতে তিনি দীর্ঘ প্রয়াসের পর আসুর ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আর-একটি চুক্তিতে উপনীত হন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে '৮৭ সালে শ্রীলংকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ভারত–শ্রীলঙ্কা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের মতো রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে রাজীব গতিময়তা পছন্দ করতেন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন যেখানেই তিনি গেছেন সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। আসলে সারা বিশ্বে তিনি ছিলেন যৌবনের দূত।

১৯৮৮ সালে মালদ্বীপে সেনা-অভ্যুত্থান রুখতে ওই দেশের রাষ্ট্রপতির অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাজীব সেখানে সেনা পাঠান। সেই সেনা অভিযান সফল হয়। ওই বছরেই ভারত-চীন সম্পর্ক মসৃণ করার ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর করার জন্য রাজীব চীন সফরে যান। তারই চেষ্টায় দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের কাঠিন্য অনেকটাই নরম হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে সব ভুল-বোঝাবুঝি ছিল তা ধীরে-ধীরে কমতে থাকে। একইভাবে রাজীব গান্ধী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশে যান মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে। আমেরিকা, মিশর, জাপান যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই তাঁর সহজ-সরল এবং আন্তরিক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন।

নিজের দেশের গরিব এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্যও তিনি নানা প্রকল্প চালু করেছিলেন। '৮৯ সালে এজন্যই তিনি জওহর রোজগার যোজনা চালু করেন। এছাড়া তিনি কৃষকদের জন্য ঋণ প্রকল্প এবং ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের সূচনা করেন।

এসব সত্ত্বেও রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরের শাসনকালে বোফর্স কামান কেনার দালালি নিয়ে অভিযোগ ওঠায় তাঁর পরিচ্ছন্ন ইমেজে কালি লাগে। তবে পরবর্তী সময়ে এই অভিযোগ বিরোধী নেতারা কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারেননি। রাজীবের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে দু-দু'বার তার জীবননাশের চেষ্টা চালানো হয়। প্রথমবার রাজঘাটে জাতির জনকের সমাধি ক্ষেত্রে একটি ঝোপের মধ্য থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তবে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অন্যবার শ্রীলংকা সফররকালে 'গার্ড অব অনার' নেওয়ার সময় জনৈক সিংহলি নৌসেনারোহণ বিজয়মুনি তাঁর মাথা লক্ষ্য করে রাইফেলের কুঁদো চালান। সে-যাত্রাও রাজীব ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

'৮৯ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজীব প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সবাধিক আসন পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। রাজীব কিন্তু সরকার গড়ার দাবি থেকে সরে এসে বিরোধী আসনে বসার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি বিরোধী নেতা হন।

'৮৯-এর ডিসেম্বর থেকে '৯১-র ২১ মে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রাজীবে জীবন নানান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেটেছে। ক্ষমতা হারানোর পর প্রথমদিকে কিছুটা শান্তভাবে কাটলেও, এক বছর যেতে-না-যেতেই আবার নানা রাজনৈতিক চাপ তাঁর ওপর পড়ে। চন্দ্রশেখরকে মদত দিয়ে ভি পি সিং সরকারকে ফেলার পিছনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পরবর্তিকালে চন্দ্রশেখর সরকারের ওপর থেকে সাহায্যের হাত সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। চলতি বছরে লোকসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করেন, এমনকি ২০ মে দিল্লিতে ভোট দিয়েই বেরিয়ে পড়েন নির্বাচনী প্রচারে।

এরপর ২১ মে মাদ্রাজ থেকে ৪০ কিমি দূরে শ্রীপেরুমবুদুরে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবার আগে জনগণের কাছ থেকে ফুলের তোড়া ও মালা নেওয়ার সময় ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এক মহিলার কাছ থেকে পুষ্পস্তবক গ্রহণ করার সময় তীব্র বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্রাণপ্রাচুর্যে-ভরা পৌনে ৪৭ বছরের টগবগে যুবক। সদাহাস্যময় মুখটি লম্বা চওড়া শরীরটি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। লক্ষ-লক্ষ কংগ্রেসকর্মী তাদের প্রিয় নেতাকে হারাল। রাহুল-প্রিয়াংকা তাদের ড্যাডকে হারাল, আর সোনিয়ার স্বপ্নের মানুষটি চিরতরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। তৃতীয় বিশ্বের শান্তিকামী কোটি-কোটি মানুষ তাদের অধিনায়কের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল। একবিংশ শতাব্দীতে দেশকে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্নদেখানো সরল মানুষটি ৮৫ কোটি দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে চলে গেলেন নীল আকাশে—যেখানে তিনি পাখির মতো ভেসে বেড়াতে পারবেন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। ■

"ওর বাসামো" আর কাঁদে না

ইতালির তুরিনের কাছে সোনিয়ার গ্রাম ঘুরে এসে লিখেছেন **বৈজু নরতনে।**

ওর বাসামো আর কাঁদে না। মাইনো পরিবারের সেই আকাশিয়া ঝাড় ও লাল চেরি বৃক্ষ আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র গৃহে এখন নিস্তব্ধতা। শুধু কিছু সাংবাদিক এ বাড়িতে আনাগোনা করছে কিছু একটা লেখনীর আকার সংগ্রহের নেশায়। ধূসর বর্ণের এ বাড়িতে পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুঃখ বেদনার কোনো ছাপ বাইরে নেই।

সোনিয়ার বড় বোন অনুসকা স্বামী ও দু'সন্তান নিয়ে বাস করেন ১৪ ভিয়া বেলিনিতে। সাংবাদিকরা তাঁর এই নির্জন আবাসেও হানা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ইন্টারফোনে তাদের জানিয়ে দেন–তার বাইরে আসার অপারগতার কথা। অনুসকা বলেন, "আমি কিছু জানি না এবং আমি কিছু জানতে চাই না। আমি টেলিভিশন বন্ধ করে রেখেছি এবং এটা আর খোলার ইচ্ছা নেই। আপনারা যদি আমাদের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন তবে চলে যান।"

সোনিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের স্যাটারও বন্ধ। গত গ্রীষ্ম থেকেই এটা বন্ধ রয়েছে। সোনিয়ার মা পাওলা প্রীডেবন রোমে কনিষ্ঠা নাদিয়ার সঙ্গে বসবাসের জন্য চলে যাওয়ার পরই সোনিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ। নাদিয়া এক পর্তুগীজ কূটনীতিককে বিয়ে করেছেন।

সরকারি প্রতিক্রিয়াও খুব মাপা। পররাষ্ট্র মন্ত্রী গিয়ানি দ্য সিচেলিস এবং প্রধানমন্ত্রী গিওলিও আঁদ্রেওতি উভয়েই শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। ওর বাসামোর মেয়র গিসেপি মাটোসিয়া একটি সাধারণ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শোক জানিয়েছেন। স্থানীয় ধর্মযাজক ডন গিসেপি আলাম্দা তাঁর অনুসারীদের শান্তির জন্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু রোমের সরকারি-প্রতিক্রিয়া বাদ দিলে ওর বাসামোতে সোনিয়ার উপকথা (অর্থাৎ যে সোনিয়া সকলের চোখের মণি ছিল) এখন আবার ইন্দিরা গান্ধীর উত্তরাধিকারিণী হিসেবে এক ছায়া ফেলেছে। অনেক দূরের এক স্থানে রাজীব গান্ধীর হত্যা যে সাধারণ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয়, এটা এখানের মানুষের গভীর চেতনায় উপলব্ধি করা যায়। তুরিনের আশোপাশে গান্ধী পরিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনা সাধারণ মানুষ সোনিয়ার বাল্যের স্মৃতিচারণের দ্বারা তাদের প্রকৃত বেদনা ও অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

রুয়ে বেলিনিতে প্রতিটি লোকই এই মাইনো পরিবারকে জানে। সোনিয়াদের জনৈক প্রতিবেশী জানান, "ছোটবেলা থেকেই আমি ওদের দেখেছি। সোনিয়া বড় হয়ে শিক্ষক হতে চেয়েছিল। তার জীবন এখনো পর্যন্ত উপকথায় ভরা। আমরা ওকে "ওরবাসামোর অবহেলিত রূপ (সিনডেরেলা অব ওর বাসামো) বলে আখ্যায়িত করেছি।"

ওদের বাড়ির রাস্তার অপরদিকে থাকেন পোশাক প্রস্তুতকারী এরমিনিয়া গ্যালিনো।, সোনিয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট স্মৃতি ব্যক্ত করে বলেন, সোনিয়ার মা প্রায় সময় ওকে নিয়ে আমার ফ্যাক্টরীতে আসতেন। সোনিয়া খুব শান্ত ও ভাল মেয়ে। বড় হওয়ার পর ওকে কমই দেখতাম কিন্তু আমি এটা মনে করি না যে, ওইরকম একটা উল্লেখযোগ্য বনেদী পরিবারে সোনিয়ার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সে কোনোভাবে বদলে গেছে।

তাঁর (সোনিয়ার) বান্ধবী মহলও বলে–সোনিয়া, এতটুকুও বদলায়নি, সে আমাদের থেকে দূরে সরে যায়নি বা উদ্ধত হয়নি। সোনিয়ার স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী গ্র্যাজিলা ভিয়েটো বলেছেন, সোনিয়া একবার এখানে প্রিয়াঙ্কা ও রাহুলকে নিয়ে এসে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল।

সোনিয়ার পিতা ছিলেন আসলে এক নিজস্ব ভুবনের মানুষ। ১৯১৮ সালে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ভিসেঞ্জা প্রদেশের লুসিয়ানায় তাদের বাড়ি ছিল। মা পাওলার বাড়িও একই এলাকায় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৫০-এর দশকে তাদের ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। বাবা মাইনো তখন ক্ষুদ্র নির্মাণ কাজের ব্যবসা শুরু করেন। এতেই মাইনো এক স্বাভাবিক ধনী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে সমর্থ হন। মাইনো পরিবার আজ থেকে ৪৫ বছর আগে পিয়েমন্ট অঞ্চলে (তুরিন) আসেন। এর আগে তাঁরা সাঙ্গানোতে একটি ছোট বাড়িতে বসবাস করতেন। সোনিয়ার বাবা স্টেফানো মাইনো ১৯৮৮ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭০ বছর বয়সে মারা যান।

বাবা মাইনো সর্বদা সোনিয়ার জন্য চিন্তা করতেন। তার মেয়ে ভারতীয় নয়, এটাই ছিল তার চিন্তা। ইন্দিরার মৃত্যুর পর সোনিয়ার জন্য তাঁর চিন্তা আরো বেড়ে গিয়েছিল। শুধু সোনিয়ার জন্যই নয় বরং রাজীবের জন্য চিন্তা আরো বেশি ছিল। ভারতে একবার ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গোলযোগের সময় সোনিয়ার বাবা দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেন।।

সোনিয়া, রাজীব, এবং তাদের সন্তানরা (প্রিয়াংকা ও রাহুল) যখন এখানে অবকাশ যাপনে আসতেন তখন তাঁরা রাস্তায় বেড়াতেন এবং কখনো কখনো গ্রামের দোকানে ঢুকে পড়তেন। এ অঞ্চলের প্রতিটি লোকই তাদের স্মরণে রেখেছে। একবার রাজীব আমাদের বাসার দরজায় কড়া নাড়েন। একটি শ্যামা পাখি খাঁচা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় রাজীব সেটা খুঁজতে খুঁজতে ওই বাড়িতে যান। তিনি (রাজীব) দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করে নেন বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্য।

এরপর খুব আনন্দ উল্লাসে রাজীব শ্যামাকে ধরেন। প্রতিবেশীদের একজন এসব কথার উল্লেখ করে বলেন, রাজীব ছিলেন মৃদুভাষী, বিনয়ী, সদা হাস্যমুখ এবং একজন আদর্শ পিতা। বন্ধুমহল, প্রতিবেশী যারা বহুবার রাজীবকে দেখেছেন এ মন্তব্য তাদের।

সোনিয়ার বোন অনুসকার মেয়ে অরুণা ভিন্সি। মাইনো পরিবারের এই মেয়েটিই একমাত্র সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলেছে। "লা রিপাবলিকা"-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অরুণা ভিন্সি বলেছে, "আমার মাসী তার স্বামীকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন এবং মেসোও তাঁর (মাসি) প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। "জিয়া" সোনিয়া মাসীই আমার ভারতীয় নাম "অরুণা" রেখেছেন। আমার ভাই (মাসতুতো) টেলিফোনে আমাকে বলেছে নির্বাচনী প্রচার কী কঠিন এবং সমস্যাসঙ্কুল। কিন্তু রাহুল আমাকে বলেছে, মেসো অবশ্যই নির্বাচনে জয়লাভ করবেন। আমার মাসী এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। তিনি উদার, ন্যায় নীতিবিদ ও বিজ্ঞ। আমার ভাইবোনও (প্রিয়াংকা ও রাহুল) কোনো প্রকার প্রশ্রয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়নি। অবশ্য মেসো ও মাসী ওদের প্রতি তেমন নজর দিতে সময় না পাওয়া সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে ওরা ওদের নামের গুরুত্ব সম্পর্কে দারুণ সচেতন এবং ওদের দায়িত্ব সম্পর্কেও।

এই দুঃখময় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমার মাসী টেলিফোনে দিদিমাকে প্রথম লাইন বলেছেন, "আমার ভাগ্যবিধান এখানে স্তব্ধ হল। আমি এখান থেকে আর এগোতে চাই না। মাসী তখন কাঁদছিলেন। যে স্বামীকে মাসী এত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকেই হারাতে হল। কিন্তু তিনি কখনো মেসোকে হারাতে চাননি। এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমার মাসী এতো মহান।

একফোঁটা চোখের জল আর সোয়ালোর গল্প

আর পাঁচজন মানুষের মতই রাজীব গান্ধীর একটা ছেলেবেলা ছিল। প্রয়াত রাজীবের সোনালি তবকে মোড়া শৈশবের সেই দিনগুলি নিয়ে অনুরাধা ঘোষের প্রতিবেদন।

রাজীবের জন্মই ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, অন্তত সেইরকমই তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন, এক ইন্টারভিউতে তাঁকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে।

শৈশবে কীরকম ছিলেন রাজীব ? মায়ের কাছে-কাছে থাকতে ভালোবাসতেন তিনি, মায়ের সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ নৈকট্য ছিল। শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য সেই সময়ে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন, সবে অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। এবং তিনি তখন দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা। বাগানের ফোয়ারাটির অদ্ভুত সব গুণ রয়েছে—মায়ের মুখে আশ্চর্য এই গল্প শুনে ছোট্ট রাজীব কৌতূহলী চোখ নিয়ে বসে থাকতেন ফোয়ারার পাশে, কাঠি দিয়ে নেড়ে দেখতেন জল। শ্রীমতী গান্ধী যখন নিভৃতে বিশ্রাম চাইতেন, "ফোয়ারা"—এই শব্দটি উচ্চারণ করলেই রাজীব বাইরে চলে যেতেন দ্রুত, তার সেই আশ্চর্য ফোয়ারার কাছে।

স্কুলজীবনে রাজীব ছাত্র হিসাবে সাধারণ ছিলেন, কিন্তু উড়ান সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ পায় শীঘ্রই। রাত জেগে তিনি এরোপ্লেনের ছবি দেখতেন। এরোপ্লেনের ছবি ও মডেল তৈরির কাজে তাঁর সময় কেটে যেত। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে নয়াদিল্লির হেলি রোডে এলিজাবেথ গবা-র স্কুলে তিনি প্রায় আড়াই বছর পড়েন। রাজীবের সময়কার কয়েকজন শিক্ষকের সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রথমদিকের স্কুল-রিপোর্টে জানা যায় যে, রাজীব নিয়মিতভাবে স্কুলে আসতেন। তাঁর গৃহ-পরিবেশ তাঁর মানসিক বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল ছিল না। সম্ভবত রাজনীতির পরিবেশ এবং স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের অনুপস্থিতির কারণে। শ্রীমতী গবা-র ঐ সময়ে লেখা এক রিপোর্টে জানা যায় যে, তাঁর মতে, আবেগগত বিপর্যয়ের কারণে রাজীবের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আরো জানা যায়, রাজীবের হস্তলিপি পরিষ্কার ও গুছোনো এবং তাঁর লেখা চিঠিগুলি আঁকা ছবি বলে মনে হতো। রূপকথা সম্পর্কে রাজীবের দুর্বলতার কথাও জানা যায়। আট বছর বয়সে রাজীবের লেখা একটি গল্প স্কুল-সূত্রে পাওয়া গেছে। 'সুখী রাজপুত্রের গল্প'। রাজীব লিখছেন : একদিন এক সোয়ালো পাখি এক সুখী রাজপুত্রের মূর্তির নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ একফোঁটা জল পড়ে তার শরীরে, আর সে মাথা তুলেই দেখতে পায় চাঁদ আর তারাদের। আরো একফোঁটা জল পড়ে, আর এবার সে দেখতে পায় রাজপুত্র গরিব মানুষদের দুঃখে কাঁদছেন। রাজপুত্র সোয়ালোকে অনুরোধ করেন তাঁর নিজের অলঙ্কারগুলো গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সোয়ালোটির মৃত্যু হয় একদিন। আর সর্বস্ব দানের পর রাজপুত্র তখন রিক্ত। রাজ্যের কর্তাব্যক্তিদের তখন আর পছন্দ হচ্ছে না। রাজপুত্রের মূর্তিটিকে। নিজের-নিজের মূর্তি স্থাপনের ইচ্ছায় তখন তারা ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে।

রাজীবের গভীর রসবোধ ছিল, অথচ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী। তাঁর শিক্ষকেরা তাঁর খাদ্যে অনীহার বিভিন্ন গল্প শোনান। রাজীব প্রায়ই তাঁর টিফিন ক্যারিয়ার লুকিয়ে রেখে খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। স্কুলে কিছুদিন কাটানোর পর অবশ্য রাজীব নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করলেন। নিজে না গাইতে পারলেও তিনি গান ভালোবাসতেন, এবং তাঁর তীব্র উৎসাহ ছিল ছবি আঁকায়। এরই সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর শিল্পবোধ এবং প্রবল পর্যবেক্ষণক্ষমতা। স্কুল ছাড়ার কিছু আগে হাবিব তনবির নির্দেশিত একটি নাটকে রাজীব এক মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং এই অভিনয়ে তাঁকে তাঁর স্বরচিত একাকিত্বের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে।

মানসিকতার দিক থেকে, ভাই সঞ্জয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন রাজীব; তিনি কম কথা বলতেন, পছন্দ করতেন নিজের সঙ্গ। নৈপুণ্যে বিশ্বাসী রাজীব সমালোচনাকে ভয় পেতেন চিরকাল। স্বল্প উৎসাহদানই তাঁর কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিত। পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব কাজে তাঁর মনঃসংযোগ বেড়ে চলল ধীরে ধীরে। কল্প-কাহিনী পাঠে রাজীবের উৎসাহ কঠিন ঘটনাকেন্দ্র থেকে চ্যুত হয়ে কল্পনায় আশ্রয় নেবার এক প্রবণতাকেই নির্দেশ করে। সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করতে পিছপা ছিলেন না তিনি, এক অসাফল্যের আশঙ্কা তাঁকে ত্রস্ত করত।

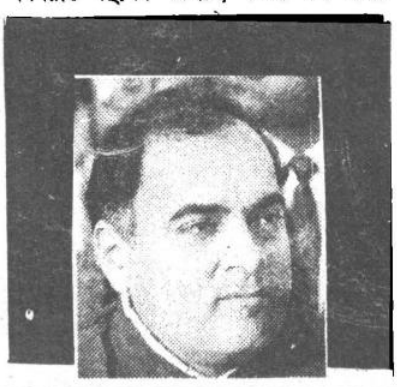

রাজীবের ছোটোবেলার ভাই প্রাইমারি স্কুল যখন তার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে, ১৯৮৮-তে, রাজীব তখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ উপলক্ষ্যে এক বার্তা পাঠান : "শ্রীমতী গবা-র কিন্ডারগার্টেন (বর্তমান শিবনিকেতন স্কুল) আমার অনেক সুখস্মৃতির আঁধার। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি আমার শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি।" সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাতে শ্রীমতী গবা-র নোটবই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছিল : "শিশুদের কে সম্পূর্ণ বোঝে ? তাদের স্থান স্বর্গের এত কাছে, অথচ নরকের সঙ্গে নৈকট্যও বিপজ্জনক ---- তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাকে আনন্দিত করে, তাদের নির্ভয় সহজতায় আমি সুখী হই। আমার চেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা এই, যে তাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সত্তার প্রতি তারা যেন সত্যনিষ্ঠ থাকে, বিশ্বস্ত থাকে এবং আত্ম-আবিষ্কারে সার্থক হয়। বয়স্ক পৃথিবীর অসুস্থ প্রভাব, যা তাদের সৌন্দর্য নষ্ট করতে প্রয়াসী, তাকে যেন তারা এড়াতে পারে, এই আমার প্রার্থনা।"

বয়স্ক পৃথিবীর এই অসুস্থ প্রভাবেই কি হারিয়ে গেল রাজীবের অমল শৈশব এবং পরবর্তী সমৃদ্ধ জীবনচর্যা ?

নক্ষত্রের অকালমৃত্যুতে দুন স্কুল শোকাহত

দুন স্কুলের ছাত্র ছিলেন রাজীব গান্ধী। রাজীবের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ এই স্কুল। সাবিত্রী চৌধুরীর প্রতিবেদন।

বুধবারের কাকডাকা ভোর ধীরে-ধীরে সকাল হচ্ছে। দীর্ঘকায় গাছের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি মারছে প্রভাতসূর্যের আলো। কিন্তু দুন স্কুলের প্রার্থনাঘরে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। দৈনন্দিন নড়াচড়া, কাশির শব্দও নেই। ভৌতিক এক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোটা স্কুল। বিস্ময়াহত ছাত্র-শিক্ষকেরা জড়ো হয়েছেন তাঁদেরই স্কুলের এক অতিপ্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্রের আকস্মিক মৃত্যুর শোকসভায়।

অভিশপ্ত সেই গোটা দিনেই দুন স্কুলের ওপরে ঝুলে ছিল এক অস্বাভাবিক শান্তি। দিনটা ছিল ছুটির। তবু ছেলেরা কেউ মাঠে খেলতে যায়নি। শান্তভাবে যে যার ডর্মিটরিতে বসে চুপচাপ রাজীব গান্ধীর নৃশংস মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছে। প্রিন্সিপল সমীররঞ্জন দাসও স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, দুন স্কুলের পক্ষে এটা বড়ো ক্ষতি।" রাজীবকে যাঁরা পড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র শেল ভোরা ছাড়া আর কেউই এখন দুন স্কুলে নেই। ভোরা অঙ্ক করাতেন। কিন্তু সমীরবাবুর মতে, রাজীবের মৃত্যুর শোক বর্তমান শিক্ষকেরাও ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন।

১৯৫৫ সালে রাজীব যখন দুন স্কুলে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন তখন সেখানে পড়াতেন এস ভাণ্ডারী। এখন তিনি ওয়েলহ্যামস্ বয়েজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল (উল্লেখ্য, এখানেও রাজীব কিছুদিন পড়েছিলেন)। ভাণ্ডারী জানালেন, "হয়তো আমি কংগ্রেসকে ভোট দিই না। কিন্তু রাজীবকে পছন্দ করতাম। ওকে খুব মিস্ করব।" তিনি আরো জানালেন, শিক্ষকদের খুবই সম্মান করতেন রাজীব। প্রধানমন্ত্রী হবার পরও তাঁদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন। শেল ভোরা জানালেন, রাজীবের ওপর নির্মিত একটা তথ্যচিত্রে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, রাজীব কখনোই ভালো ছাত্র ছিলেন না। এ-নিয়ে রাজীব নিজেও হেসেছেন। কিন্তু কখনোই এ-নিয়ে কিছু মনে করেননি।

সত্যি কথা বলতে কি, রাজীব যখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানচালক ছিলেন, তখন তাঁর অনেক সতীর্থই জীবনে আরো অনেক বেশি এগিয়েছিলেন। অরুণ পুরি, সুমন দুবে, মণিশঙ্কর আয়ার রাজীবের দুন স্কুলেরই বন্ধু। স্কুলেও রাজীব অনেকের চেয়েই পিছিয়ে ছিলেন। দুন স্কুলের পরিচালন-ব্যবস্থা ছাত্রদের ওপর অনেকখানি ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজীবের মধ্যে সেরকম কোনো নেতৃত্বগুণ বা পাণ্ডিত্য দেখা যায়নি। অধিকাংশ শিক্ষকেরই স্মৃতি- রাজীব শান্ত, লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। ভোরা জানিয়েছেন, রাজীব স্কুলের নিয়মকানুন ঠিকঠাক মেনে চলতেন। কখনোই কোনো উপদ্রব সৃষ্টি করেননি। এজন্য শিক্ষকরা আজও তাঁর কথা মনে করেন।

পণ্ডিত নেহরু প্রায়ই নাতিকে দেখতে স্কুলে আসতেন। কিন্তু প্রচার এড়াতে অপেক্ষা করতেন সার্কিট হাউসে। নিজের এ ডি সি-কে পাঠাতেন রাজীবকে তুলে আনতে। একবার রাজীবকে নিয়ে পণ্ডিতজি চক্রতায় গিয়েছিলেন। ট্রাফিকের কারণে দেরি হয়ে যায়। রাজীবের ভয় ছিল তাঁর ডিনারে দেরি হয়ে যাবে। তাই পণ্ডিতজিকে তিনি বাধ্য করলেন তাঁকে সরাসরি স্কুলে পৌঁছে দিতে। পণ্ডিতজিকে দেখবার পেয়েছিলেন শুধু স্কুলের দারোয়ান।

রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসা সত্ত্বেও রাজীবের ইতিহাস বা শিল্পে কোনো আগ্রহ ছিল না। সাধারণমানের ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকরা অনেকেই তাঁকে খারাপ ছাত্র বলেই মনে করতেন। তবে বিজ্ঞানে আগ্রহ ছিল তাঁর। সাঁতার ছাড়া অন্য কোনোরকম খেলাধুলোয় কোনো আগ্রহ ছিল না। সেই ছাত্রই ১৯৮৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। হঠাৎই। স্কুলে কোনোদিন যে মনিটরও হয়নি, সে হয়ে গেল দেশের কর্ণধার। রাজীবের অবদানের কথা বিচার করবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু দুন স্কুল যে তাঁর জন্য গর্বিত—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনমূর্তি ভবনে অ্যাম্বুলেন্সে আসছে রাজীবের মরদেহ

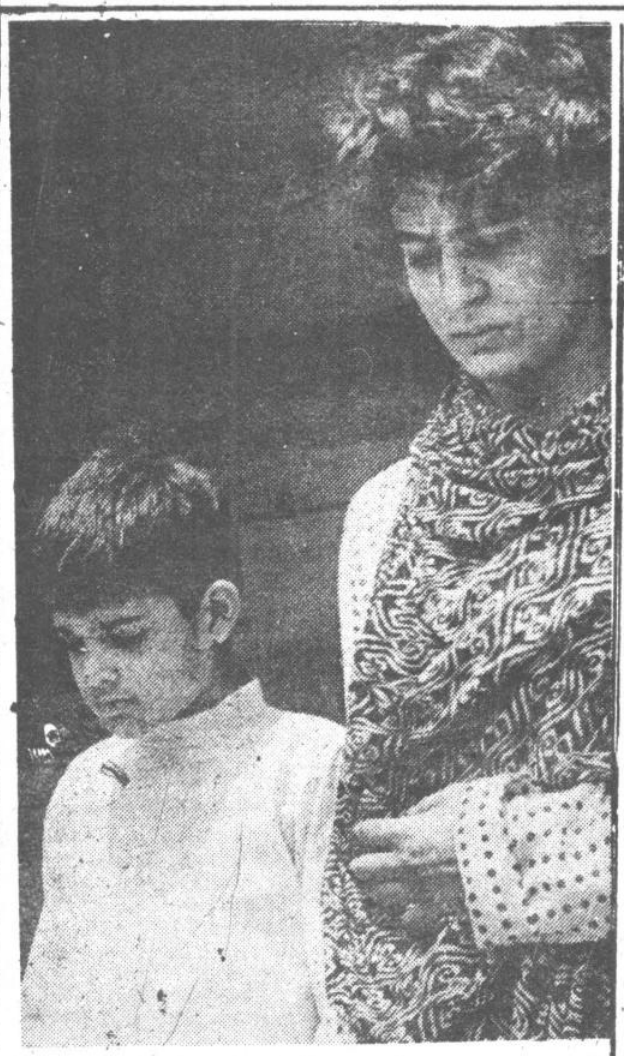

বরুণ গান্ধীর সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা

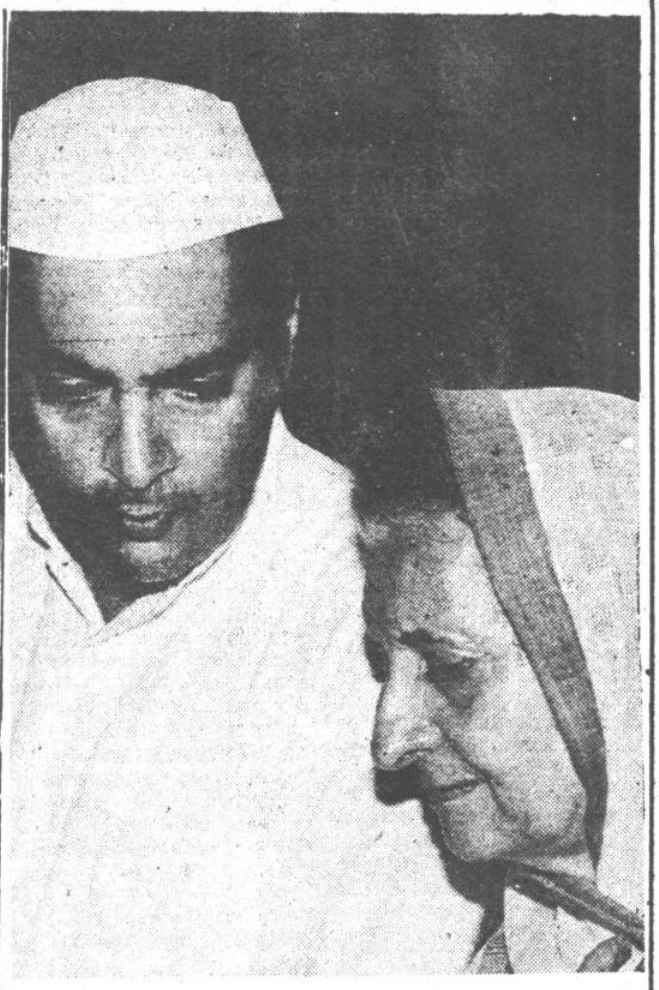

মায়ের সঙ্গে রাজীব

দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে রাজীব

স্পোর্টিং রাজীব

খেলার মাঠ এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গেও রাজীব গান্ধীর ছিল নিবিড় সম্পর্ক —জানাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য।

৮৮ সালের কথা। শিলিগুড়িতে তখন নেহরু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। সংগঠক আই এফ এ-র অস্থায়ী দপ্তর তখন হোটেল সিনক্লিয়ার্সে। একদিন রাতে আই এফ এ-র দপ্তরের টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠলো। অপারেটর জানালো "কল ফ্রম প্রাইম-মিনিস্টার হাউস"। সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত টেলিফোন তুলতেই রাজীব গান্ধী জানালেন, "জরুরি কাজে আটকে গেছি। আসতে পারছি না। তবে এই টুর্নামেন্টের সাফল্য আমি কামনা করছি।" অনেকদিন পরে এই ঘটনাটি বলেছিলেন প্রদ্যোৎবাবু।

বস্তুত রাজীব গান্ধীর খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ কতটা ছিল তা এই ঘটনার থেকে প্রমাণিত হয়। রাজীব নিজে টেলিফোনে না করে তার কোনো সচিবকে দিয়েও এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে পারতেন। কিন্তু করেননি। শুধু তাই নয়, নেহরু কাপের দৌলতেই শিলিগুড়ি জাতীয় দূরদর্শনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবং এর জন্য নতুন টাওয়ার বসানো এবং তার ব্যয়বরাদ্দ—এসব কিছুই হয়েছিল রাজীব গান্ধীর প্রত্যক্ষ মদতে। যদিও এক্ষেত্রে অজিত পাঁজাও এগিয়ে এসেছিলেন।

মনে পড়ে যাচ্ছে '৮২ সালের দিল্লি এশিয়াডের কথা। ফুলটাইম সাংবাদিক হিসাবে তখনো প্রতিষ্ঠিত নই। কিন্তু পরে একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট কভার করতে গিয়ে হংকং-এর এক সাংবাদিক বলেছিলেন '৮২ সালে দিল্লি এশিয়াড হতে পেরেছিল রাজীব গান্ধীর জন্যই। হংকং-এর সাংবাদিকটি ডুবে গিয়েছিলেন অতীতের মধ্যে। হারিয়ে যাচ্ছিলেন নস্টালজিয়ায়। সেদিন বলেছিলেন রাজীব তখন কিছুই নন। কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে সবাইকে জয় করে নিয়েছিলেন। ওয়েট লিফটিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়নি। বিচারকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতা শুরু করা সম্ভব নয়। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব সারারাত জেগে ঐ প্ল্যাটফর্মকে আধুনিকভাবে তৈরি করে ফেলেছিলেন। দিল্লির একটি প্রথম সারির দৈনিকে ছবিও বেরিয়েছিল রাজীবের। হাতুড়ি হাতে নিজে পেরেক ঠুকছেন।

শুধু এই ধরনের কাজেই নয়। রাজীব দিল্লি এশিয়াডের আগে শহরকে সাজানো এবং তার সংস্কারের কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন। আজকের আধুনিক দিল্লি গড়ে ওঠার নেপথ্যে রাজীবের অবদান কম নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে এশিয়ান গেমসের আরো একটি ঘটনার কথা। সোনা জিতে চাঁদরাম সোজা উঠে এসেছিলেন ভি ভি আই পি-তে বসা রাজীব গান্ধীর কাছে। চাঁদরাম সেদিন রাজীবকে বলেছিলেন দেশকে তো আমি সোনা এনে দিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন আমার চাকরিতে কোনো পদোন্নতি হয়নি। আপনি দেখুন। চাঁদরামের কথা শুনে রাজীব সঙ্গে সঙ্গে মিলখা সিংকে ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেন। ঐ সময়ে চাঁদরাম ভারতীয় সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তাকর্মীদের ডিঙিয়ে যখন বিদেশী সাংবাদিকরা ভি আই পি গ্যালারিতে এলেন তখন চাঁদরাম ইন্টারভিউ দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রাজীব। কলকাতার এক সাংবাদিকের কাছ থেকে টেপ রেকর্ডারটি নিয়ে চাঁদরামের দেওয়া হিন্দি ইন্টারভিউটি রাজীব বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য ইংরাজিতে তর্জমা করে দিয়েছিলেন। আসলে এইসব টুকরো টুকরো ঘটনা প্রমাণ করে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাজীব গান্ধীর মধ্যে ছিল।

পরবর্তীকালে রাজীব প্রধানমন্ত্রী হবার পর খেলাধূলার উন্নতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ফুটবলের উন্নতির জন্যও ভাবতেন। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি যখন যোশেফ গেলিকে ভারতে আনার জন্য ডলার অনুমোদনের জন্য গিয়েছিলেন তখন রাজীব এককথায় তা অনুমোদন করেছিলেন। যদিও সেইসময় ভারত সরকারের বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট ছিল।

রাজীব নিজে খেলতে ভালোবাসতেন গল্ফ আর টেনিস। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। কপিলদেব একবার বলেছিলেন '৮৩ সালে কথা যখন আমরা বিশ্বকাপ জিতি তখন সারারাত ধরে উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলোর রেডিও-তে কান পেতে রেখেছিলেন তিনি। কপিলের যারা অন্তরঙ্গ তারা প্রত্যেকেই জানেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ দেখে কপিল যুব কংগ্রেস যোগ দেননি। আসলে রাজীবের খেলাধূলায় প্রতি আগ্রহ এবং আন্তরিকতা দেখেই কপিল যুব কংগ্রেসে যোগ দেন।

উইম্বলডন অথবা ফরাসি ওপেনের টাট্‌কা ফাইনাল খেলা দূরদর্শনে দেখানো এসব কিছুর নেপথ্যেই ছিলেন রাজীব। রিলায়েন্স বিশ্বকাপ ক্রিকেট এবং নেহরু ক্রিকেট করার সময়েও এগিয়ে এসেছিলেন রাজীব গান্ধী। তার উদ্যোগেই কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করেছিল। তাই রাজীব গান্ধীর এই অকালমৃত্যু ক্রীড়াঙ্গনকে করে দিল অভিভাবকহীন। ■

এশিয়ান ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে জওহর জ্যোতি হাতে রাজীব গান্ধী।

সম্ভাব্য আততায়ী ঘটনাস্থলে এসে গেছিল বেশ খানিকটা আগেই। দাঁড়িয়েছিল মহিলা কংগ্রেস কর্মীদের মাঝখানে। উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে আততায়ীর দুপাশে রয়েছেন লতা কানন এবং তাঁর কন্যা কোকিলা কানন। এরপর রাজীব গান্ধী এসে পৌঁছলে পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যায় আততায়ী। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা যখন প্রিয়নেতাকে শাল, ফুল, মালা দিতে ব্যস্ত তখন ভীড় ঠেলে একেবারেই সামনে চলে যায় সে। রাজীবের হাতে তুলে দেয় মালা। অতঃপর নীচু হয়ে প্রণামের ভঙ্গি এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ। রাজীবের পেট, বুক, মাথা তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়ই, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আততায়ী ঐ মহিলার দেহের মাঝখানটুকুও। মাথাটা ছিটকে গিয়ে পড়ে অনেকদূরে। পরে তদন্তকারী অফিসাররা তার দেহের বিভিন্ন অংশ তুলে এনে সাজিয়ে একটা আকৃতি দেবার চেষ্টা করেন। তদন্তের স্বার্থে। নীচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে সাজানো রয়েছে আততায়ীর ছিন্নভিন্ন দেহের বিভিন্ন অংশ। বুক, পিঠ একেবারেই নেই। এথেকেই অনুমান আরো দৃঢ় হচ্ছে, বোমা বাঁধা ছিল তার শরীরের মধ্যাংশেই।

নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য সুসংবাদ

বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বিজ্ঞানসম্মত সর্বাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে সর্ববিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে নিঃসন্তান দম্পতির সাহায্য করেন।

Infertility Research Institute

30, Ripon Street, Calcutta 700 016

সর্বাধুনিক ল্যাবরেটরি, আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ত্রুটি নির্ধারণ ও সন্তানহীনতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সুচিকিৎসা ও গবেষণার একটি কেন্দ্র।

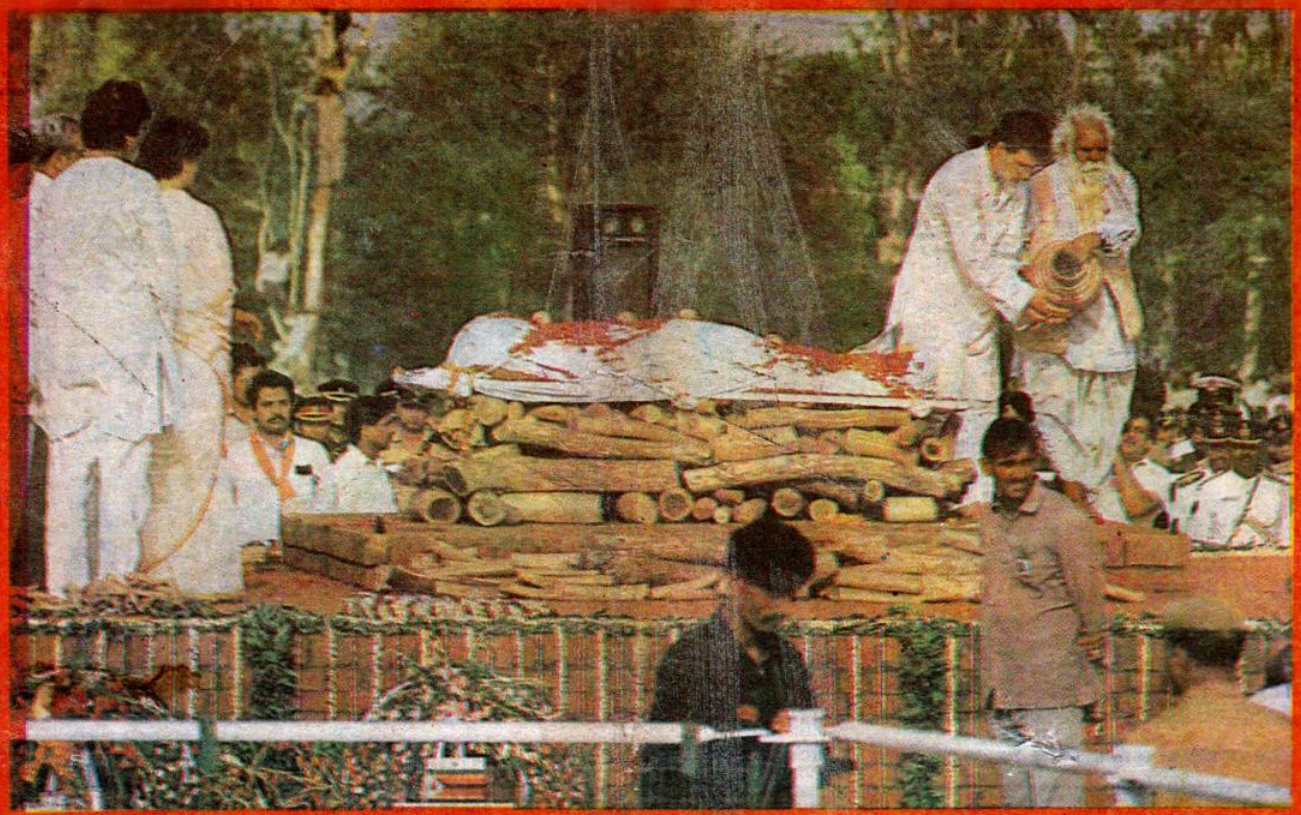

শক্তিস্থলে রাজীব গান্ধীর শেষকৃত্য